বিষধর

রোমহর্ষক
কিশোর থ্রিলার

জাফর চৌধুরী

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার-৪৪

রোমহর্ষক সিরিজের দ্বিতীয় বই

বিষধর

জাফর চৌধুরী

রেজা আর সুজাকে চিড়িয়াখানা দেখাতে
নিয়ে চললো তাদের বন্ধু আকরাম।
চিড়িয়াখানার গবেষণাগারে কাজ করে সে।
শোনা গেল বিপদ সংকেত : খাঁচা থেকে পালিয়েছে
সদ্য আনা এক মারাত্মক বিষধর কালকেউটে।
বিষ ছড়িয়ে পড়লো ডক্টর ডেনমারের রক্তে।
আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো শহরে।
ফাঁসিয়ে দেয়া হলো বেচারা আকরামকে।
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো দুই ভাই।
দেখা যাক কি হয়!

বাইশ টাকা মাত্র

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা সিরিজ ঃ

রকিব হাসান

তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা, ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো, প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগরসৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত, হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি, কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি, ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য-১,২, ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব, খেপা শয়তান, রত্নচোর, পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভুতুড়ে সুড়ঙ্গ, আবার সম্মেলন, ভয়াল গিরি, কালো জাহাজ, পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল।

অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ ঃ

নিয়াজ মোরশেদ

ষড়যন্ত্র-১,২

জাফর চৌধুরী

অনুসন্ধান

রোমহর্ষক সিরিজ ঃ

জাফর চৌধুরী

যাও এখান থেকে

কিশোর থ্রিলার-৪৪

রোমহর্ষক সিরিজের দ্বিতীয় বই

বিষধর

জাফর চৌধুরী

সেবা প্রকাশনী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৯০

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রণ :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BISHODHAR
By : Jafor Choudhury

পরিচয়

বাঙ্গালী দুই ভাই, রেজা মুরাদ আর সুজা মুরাদ।
বাবা-মায়ের সংগে থাকে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের
ছিমছাম সুন্দর শহর বেপোর্ট-এ।
বাবা মিস্টার ফিরোজ মুরাদ ছুঁদে গোয়েন্দা।
বাবার মতোই গোয়েন্দা হতে চায় দুই ভাই,
অ্যাডভেঞ্চার পাগল।
সুযোগ পেলেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালায়,
ভয়ংকর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হয় মৃত্যুর মুখোমুখি।
বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ, সুদর্শন ওই দুই তরুণকে নিয়েই
রোমহর্ষক সিরিজের কাহিনী।

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও কর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পৌঁছে দিন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে রাখলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হরফে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।—লেখক।

এক

'যাচ্ছি কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলো রেজা মুরাদ। ভোরের রোদ লাগছে চোখে, কুঁচকে রেখেছে চোখ-মুখ। গাড়ি চালাতে চালাতেই হাত চালালো চুলের ভেতর। ফিরে তাকালো একবার পেছনের সিটে বসা বন্ধুর দিকে।

'বাঁয়ে,' শান্তকণ্ঠে বললো আকরাম।

মোড় নিয়ে গাছপালার মধ্যে দিয়ে যাওয়া পথ ধরে আরও কিছুদূর এগোলো রেজা। নীল ভ্যানটা এনে রাখলো মস্ত এক ইস্পাতের ফটকের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করলো। ফিরে চেয়ে জানালো, 'বন্ধ।'

'বন্ধ ?' ভোঁতা প্রতিধ্বনি শোনা গেল যেন প্যাসেঞ্জার সিট থেকে। আকরামের দিকে তাকালো একজোড়া ঘুমজড়িত চোখ। 'এই সাতসকালে ঘুম থেকে টেনে তুলে বন্ধ চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে এসেছো আমাদের ?'

নীরবে একমুহূর্ত রেজার ছোট ভাই সুজাকে দেখলো আকরাম। কৃত্রিম বিষণ্ণতায় মাথা নাড়লো। 'ঘুমাও, খোকা। ঘুম

ভাঙলে আমাকে বলো।'

হেসে উঠলো রেজা। 'ওর সঙ্গে খামোকা কথা বলিস, সুজা। কথায় পারবি না। হাজার হোক উনি আমাদের প্রফেসর আকরাম খান।'

'প্রফেসর' উপাধিটা রেজাই দিয়েছে বন্ধুকে। কম্পিউটার আর ইলেকট্রনিকসে অসাধারণ জ্ঞান আকরামের।

'কথা বলবো কি?' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো সুজা। 'ধরে এখন মার লাগাবো। ব্যাটাআ! একে তো রোববার, চিড়িয়াখানা খুলতে এখনও একঘণ্টা বাকি। এতোই যদি দেখানোর ইচ্ছে, আরও পরে আনতে পারলো না?'

রেপোর্ট জুলজিক্যাল গার্ডেনে ঢোকার দরজার দিকে তাকালো রেজা, কর্মীরা ঢোকে যেখান দিয়ে। বললো, 'সুজা ঠিকই বলেছে, আকরাম। আরও পরে আনলেও পারতে।'

'দরজা তো খোলেইনি,' যোগ করলো সুজা, 'জানোয়ারেরাও নিশ্চয় এখনও ওঠেনি।'

হাসতে হাসতে ভ্যান থেকে নামলো আকরাম। 'যে জানোয়ার দেখাতে এনেছি, দেখার পর বলবে, ওটার ঘুম না ভাঙাই ভালো।'

'আবার রহস্য করে কথা বলে! ধরো তো ওকে, দাদা, কিল শুরু করি। আপনিই মুখ খুলবে।'

'রহস্য না, সুজা,' হাসিমুখে বললো আকরাম, 'ঠিকই বলছি। কয়েক হপ্তা ধরে ডক্টর ডোনাল্ড রিচারের সঙ্গে কাজ করছি। বিখ্যাত হারপিটোলজিস্ট।'

'কী লজিস্ট!' ঘুম চলে গেল সুজার।

'হারপিটো। সাপ বিশেষজ্ঞ। বিষধর সাপ আর তাদের বিষ নিয়ে গবেষণা করেন ডক্টর রিচার। বিশেষ করে গোখরা জাতের সাপ। আমার কাজ হলো, আবহাওয়া-নিয়ন্ত্রক খাঁচা বানিয়ে দেয়া। নতুন সাপের জন্যে নতুন ডিজাইনের।'

'নতুন কি আসছে এখন?' জিজ্ঞেস করলো রেজা।

'একটা অস্ট্রেলিয়ান টাইগার স্নেক, কিংবা বলতে পারো বাঘা সাপ। পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক সরীসৃপ। ক্যালিফোর্নিয়ায় ওই সাপ আর একটিমাত্র আছে। বিশেষ অতিথির জন্যে বিশেষ ঘর বানাতেই হবে।' চারপাশে তাকালো আকরাম, যেন তার গোপন কথা কেউ শুনে ফেলবে। 'তাছাড়া সাপটার অতিরিক্ত দাম। সে-জন্যেই ওটার আগমনের খবর যথাসম্ভব গোপন রাখতে চান ডক্টর।'

'আমি তো জানতাম দুনিয়ার সব চেয়ে বিষধর সাপ কেউটে।'

মাথা নাড়লো আকরাম। 'কেউটের বদনাম বেশি, লোকে চেনেজানে তো। ভারতে আর মালয়েশিয়ায় প্রতি বছর বহু লোক কেউটের কামড়ে মারা যায়।'

'তাহলে কেউটেই বেশি মারাত্মক,' রায় দিয়ে ফেললো সুজা।

হাসলো আকরাম। 'তোমার যুক্তি ফেলে দেয়া যায় না, বেশি মারলে বেশি মারাত্মক। তবে, কেউটের কামড় খেয়ে চিকিৎসা ছাড়াও অনেক সময় লোক বাঁচে। কিন্তু বাঘা সাপের কামড় খেলে আর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না করালে বাঁচার কোনো আশা নেই। মরবেই। কেউটের চেয়ে টাইগার স্নেকের বিষ চব্বিশ গুণ বেশি শক্তিশালী। আরও আছে। অন্য সাপ মানুষ দেখলে পালায়,

লুকিয়ে পড়তে চায়, টাইগার ঠিক উল্টো। বাধা পেলে তো রুখে দাঁড়াবেই, না পেলেও তেড়ে আসে। ভাগ্যিস, পৃথিবীতে ওই সাপের সংখ্যা খুব কম, আর লোকালয়ের কাছে থাকে না।'

'সাপটা তাহলে দেখার সৌভাগ্য হবে আমাদের?' আগ্রহী মনে হলো রেজাকে।

পকেট থেকে ব্রোঞ্জ রঙের ছোট একটা প্লাস্টিকের কার্ড বের করলো আকরাম। 'সিকিউরিটি পাস। গেট খোলার জন্যে। এটা দেখালেই ঢুকতে দেবে আমাকে।'

কয়েক সেকেণ্ড পরই তালা খুলে গেল। গেট খুললো আকরাম। আবার ভ্যানে উঠলো সে আর রেজা। গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকলো, থামলো এসে কর্মচারিদের পার্কিং লটে।

ছোট একটা বাড়ি দেখালো আকরাম। 'ওটা সিকিউরিটি শ্যাক। সারা চিড়িয়াখানা জুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে রাখা হয়েছে অ্যালার্মের তার আর নানারকম সেনসর। ওগুলোকে ফাঁকি দিয়ে কিছুতেই যেতে পারবে না।' পকেটে চাপড় দিলো সে। 'তবে পাস থাকলে আর অসুবিধে নেই। ...ওই যে, বাঁয়ের এল-প্যাটার্ন বিল্ডিংটা, ওটাই গবেষণাগার। ওখানেই যাবো।'

'এতো কড়াকড়ি কেন?' ভুরু কুঁচকালো রেজা। 'চিড়িয়াখানা থেকে কী চুরি যাওয়ার ভয়?'

'কিছু কিছু প্রাণী আছে, অত্যন্ত দামি,' আকরাম জানালো। 'তবে কিছু প্রাণী আছে, যেগুলো দামি হলেও চুরি করার সাহস করবে না কেউ। যেমন ধরো, আঠারো ফুট লম্বা পাইথন। তবু, বলা তো যায় না। নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেই হয়েছে কর্তৃপক্ষকে।

এতে সুবিধে আছে। ঢোকার সময় পাস লাগে, বেরোনোর সময় লাগে না। সর্বক্ষণ তোমার ওপর চোখ রাখবে ইলেকট্রনিক আই। ধরো, ভুল করে বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়লে…'

'কসম, দাদা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো সুজা, আকরামের কথায় কান নেই, তাকিয়ে আছে একটা গাড়ির দিকে। সুন্দর গাড়ি, মোটর সাইকেল, এসব তার হবি। 'পিলারি ফোর হানড্রেড! আরিশ্‌শালার, রঙটা কি দেখেছো!' পার্কিং লটের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির দিকে হাত ঝাঁকালো সে। 'যেন আগুন জ্বলছে! আমি শিওর, ওটা কাস্টোম-মেড হাই-পারফরমেন্স ড্রাইভিং মেশিন।' মৃদু শিস দিয়ে উঠলো সে।

'হ্যাঁ, সুন্দর,' রেজা বললো। 'তা দাম কি রকম হবে, জনাব গাড়ি-পাগল?'

'এই চিড়িয়াখানার কর্মীরা যা আয় করে, তার চেয়ে বেশি,' গাড়িটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না সুজা।

'হবেই তো!' তেঁতুলের টক ঝরলো যেন আকরামের কণ্ঠ থেকে। 'বেতন আর কতো পায়। আমার কথাই ধরো, একটা নতুন কম্পিউটার সিসটেম কিনতে পারলাম না আজতক। অথচ দাম আর কতো?' গাড়িটার দিকে বুড়ো আঙুল দেখালো সে, 'আগেও দেখেছি ওটা। এই চিড়িয়াখানার কারও নয়।'

'মরনিং, খান,' লটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আকরামকে শুভেচ্ছা জানালো একজন সিকিউরিটি ম্যান।

'ডিক বনার,' দুই বন্ধুর সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ডের পরিচয় করিয়ে দিলো আকরাম।

হাত মেলালো ডিক। ক্লিপবোর্ড একটা লিস্ট বের করে দেখলো। 'হ্যাঁ, অ্যাপ্রুভ লিস্টে নাম আছে।' দুটো খাম বের করে আকরামকে দিতে দিতে বললো, 'নাও। তোমার বন্ধুদের।'

'পাস,' একটা করে খাম রেজা আর সুজার হাতে দিলো আকরাম। 'বুকে লাগিয়ে রাখবে, ল্যাবরেটরিতে যখন থাকবে।'

'আকরাম,' ডিক বললো, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর খুঁজছিলেন তোমাকে। দেখা করো গিয়ে।'

ভ্রূকুটি করলো আকরাম। 'যাচ্ছি। ডিক, রেজা আর সুজাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাবে?'

'তুমি যাও।'

দ্রুত চলে গেল আকরাম। সেদিকে চেয়ে বিড়বিড় করলো ডিক, 'পাগলা রিচার আবার কামড়াবে!'

'পাগলা রিচার!' অবাক হলো রেজা। 'ডক্টর ডোনাল্ড রিচারের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক দু'জনের। বেচারা খানের চেয়ার গরম করে ফেলেছেন ডক্টর। টিকতে দেবেন না।'

'কেন?' ডিকের সঙ্গে গবেষণাগারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললো সুজা।

'কিসের জানি ওইয়ারিং করেছিলো খান। ভুলে একটা ম্যাগনেটিক স্ক্রু-ড্রাইভার রেখে দিয়েছিলো পকেটে। পকেটের বাইরে ঝুলছিলো পাসটা। পাসের কোড গড়বড় করে দিলো চুম্বক। ফলে, ল্যাবের একটা সেনসরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বেজে উঠলো পাগলাঘন্টি।'

ওদেরকে স্ন্যাক বারে নিয়ে এলো ডিক। 'আরও কিছুক্ষণ ল্যাবে ঢুকতে পারবো না। ঢুকতে মানা করেছে। নতুন সাপটাকে খাঁচায় ভরবে এখন।' মেহমানদের জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু খাবে?'

'নাস্তাই খাইনি এখনও,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো সুজা। মিনিটখানেক পরেই হট ডগ চিবাতে আরম্ভ করলো।

নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করলো রেজা, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। 'কি করে যে পারিস! এই সকাল বেলা হট ডগ···গলা দিয়ে নামে কি করে?'

'যা খিদে পেয়েছে,' চিবাতে চিবাতে বললো সুজা, 'স্রেফ শুকনো রুটিও গিলে ফেলতে পারবো এখন।' আর কথা না বাড়িয়ে ডিকের দিকে তাকালো। 'তাহলে, কার্ডের কোড মুছে গিয়েছিলো আকরাম খানের? তাতে ডাক্তারের কী? তাঁর তো কোনো ক্ষতি হয়নি?'

'আমিও তাই বলি,' রেজাও সুর মেলালো ভাইয়ের সঙ্গে। 'ডক্টরের এতো রাগার কি কারণ?'

ছোট একটা পুকুরের পাশ দিয়ে চলেছে ওরা। সীলের বাস-স্থান। তাজা মাছকে ধাওয়া করে ধরে ধরে খাচ্ছে সীলেরা। সেদিকে চেয়ে ডিক বললো, 'কারণ আছে। তখন একটা কেউ-টেকে খাঁচা থেকে বের করে দুধ দোয়াচ্ছিলেন ডক্টর। ঘণ্টার শব্দে চমকে হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন সাপটা। আরেকটু হলেই ওটা তাঁর হাতে কামড়ে দিয়েছিলো।'

হট ডগে কামড় দিতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল সুজা। 'বলেন কি! গরু দোয়াতে শুনেছি, ছাগল-মোষ-ভেড়া-উট এমনকি আল-

পাকা দোয়াতেও শুনেছি। সাপ দোয়াতে তো শুনিনি কখনও ?'

'আমি শুনেছি,' হেসে বললো রেজা। 'সাপের বিষ বের করে নেয়াকেই অনেকে বলে দুধ দোয়ানো। সাপের ওপর একবার একটা ছবি দেখেছিলাম। জোর করে হাঁ করিয়ে বিষদাঁত ঢুকিয়ে দেয়া হয় একটা কাগজের চাদরের ভেতর দিয়ে। চাদরটা বাঁধা থাকে কাচের জারের মুখে। ফোঁটা ফোঁটা বিষ ঝরে পড়ে জারের মধ্যে।'

'এই কাজকে পেশা হিসেবে নেয় লোকে ?' বিশ্বাস করতে পারছে না রেজা।

'খুব বিপদের কাজ,' একমত হলো ডিক। 'সাবধান থাকতে হয়। আর সাবধান না থেকে অন্যায় করেছে খান, ডক্টর রেগেছেন সেজন্যেই। বলেছেন, থানের চাকরি তো খাবেনই, চিড়িয়াখানার ত্রিসীমানায় যাতে ঢুকতে না পারে কোনোদিন, সেই ব্যবস্থাও করবেন।'

বাঘের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল রেজা। ভেতরে পায়চারি করছে শক্তিধর জানোয়ারটা। দেখতে দেখতে বললো সে, 'আপনার কথায় মনে হচ্ছে, ডক্টর লোক সুবিধের নন।'

'লোকের পেছনে লেগে থাকা স্বভাব তাঁর,' রেজার কথা এড়িয়ে গিয়ে বললো ডিক। 'সাপের মতো নিঃশব্দে এসে ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, কি করে দেখবেন। নিজের সহকারীকেও ছেড়ে কথা কন না,' হেসে বললো সিকিউরিটি গার্ড। 'আর ডক্টর বিগলকে তো পারলে ঘাড় ধরে বের করে দেন।'

'ডক্টর বিগল আবার কে ?' জানতে চাইলো সুজা।

'ডক্টর নেলী বিগল, চিড়িয়াখানার পার্টটাইম ডাক্তার। ইউনিভারসিটি মেডিক্যাল সেন্টারের চাকরি করেন, আমাদের এখানে কাজ করেন কন্ট্রাক্টে। দরকার হলেই এসে রোগী দেখে যান। ভালো ডাক্তার। চমৎকার মহিলা।'

হেঁটে চললো তিনজনে।

'মহিলার কাছ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত রিচারের,' হাঁটতে হাঁটতে বললো ডিক। 'ধারালো মগজ, সন্দেহ নেই; সাপ সামলাতেও ওস্তাদ। তবে মানুষ সামলানোয় একেবারে আনাড়ি, ব্যবহারই জানেন না।' হাতে ধরা কফির কাপে চুমুক দেয়ার জন্যে থামলো। 'আকরাম খানের কপালে দুঃখ আছে।'

'হয়তো কিছু বলবে না,' আশা করলো সুজা। 'এতোক্ষণে মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

শ্রাগ করলো ডিক। 'ভোলার লোক নন ডক্টর, মাপ করতে জানেন না। তোমাদের পাস যে কি করে ম্যানেজ করলো খান, সেটাই বুঝতে পারছি না।' ঘড়ি দেখলো সে। 'কিন্তু এতো দেরি করছে কেন? এতোক্ষণ তো লাগার কথা নয়।'

'চাকরি গেলে মন খারাপ হয়ে যাবে বেচারার,' আফসোসের সুরে বললো রেজা। সুজার দিকে তাকালো। 'নতুন মডেলের কম্পিউটার আর কেনা হবে না ওর।'

মাথা ঝাঁকালো সুজা। 'পাগলই হয়ে যাবে। কিছুদিন ধরে তো শুধু ওই কম্পিউটারেরই আলোচনা।'

বাদামী রঙ করা একটা পাথরে তৈরি বাড়ির কাছে এলো ওরা। ডিক বললো, 'এটাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকশন। দেখি গিয়ে,

কি হচ্ছে ?'

সিঁড়িতে অপেক্ষা করলো দুই ভাই। ডিক যখন ফিরে এলো, চিড়িয়াখানায় ঢুকতে শুরু করেছে কিছু কিছু দর্শক। সে জানালো, 'এখানে নেই। কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখি। এতোক্ষণে নিশ্চয় কাজ শেষ।'

এক ফালি ঘন বন পার হয়ে এলো ওরা। গবেষণাগারের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'দেখি, তোমার পাসটা বের করো,' রেজাকে বললো ডিক। 'কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, শিখিয়ে দিই। কার্ড নিয়ে দরজার ফ্রেমের পাশের স্লটে ঢোকাতেই খুলে গেল দরজা।

বেশি বড় নয় ল্যাবরেটরিটা। তবে প্রতিটি ইঞ্চিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। রাশি রাশি কাচের বাক্স সারি দিয়ে রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে, ওগুলোতে সাপ ভরা। একটা বাক্সে একটা টিম্বার র‍্যাটল, লেজের অসংখ্য বোতাম ঝাঁকি দিয়ে বিচিত্র ঝনঝন আওয়াজ তুলেছে। হুঁশিয়ারি। ফণা তুলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে ভয়ংকর এক কালকেউটে।

'দেখেই গা গুলাচ্ছে,' বললো রেজা। 'এই সাপের সঙ্গে বাস। আরিব্বাপরে !'

তার কথায়ই যেন রেগে গিয়ে হিসিয়ে উঠে বাক্সের দেয়ালে ছোবল মারলো কেউটেটা।

'না না না, তোমরা খুব ভালো মানুষ,' হাত তুলে সাপটাকে তোয়াজ করার ভঙ্গিতে বললো সুজা। 'তোমাদের কথা তো হচ্ছে না, বুনো সাপের কথা বলছে।' এদিক ওদিক তাকালো।

'কিন্তু আকরাম কই ?'

'দেখে আসি,' বলতে বলতেই রওনা হয়ে গেল ডিক। বারান্দার একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'নতুন সাপটা দেখতে দেখতে হয়তো ভুলে গেছে আমাদের কথা···,' শেষ করতে পারলো না রেজা, শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'ওদিক থেকে আসছে,' বলেই একটা বারান্দা ধরে দৌড় দিলো সুজা। একটা দরজার সামনে এসে পথ শেষ, দাঁড়িয়ে গেল সে। সামনে দরজার গায়ে নেমপ্লেট : ডক্টর ডোনাল্ড রিচার।

'ডক্টর রিচার্ডার!' দরজায় কিল মারতে শুরু করলো রেজা। ভারি পাল্লা।

জবাব নেই।

ফ্রেমের পাশে স্লট দেখতে পেলো সুজা। 'কার্ড ঢুকিয়ে দেখো তো, দাদা।'

ঢোকালো রেজা। সাড়া দিলো না দরজা। আবার ডাকলো সে, 'ডক্টর রিচার!'

অস্বস্তিকর নীরবতা।

মাথা নাড়লো রেজা, 'নিশ্চয় অন্য কোনো কোডে খোলে। আমাদের মতো সাধারণ দর্শক ঠেকানোর জন্যে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা।'

ততোক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে সুজা, লোক ডেকে আনার জন্যে।

মাস্টার কী নিয়ে তার সঙ্গে এসে হাজির হলো দু'জন গার্ড।

তালা তবুও খোলা গেল না।

'নষ্ট করে দিলো না তো!' বললো একজন। দরজায় কিল মেরে ডাকলো, 'ডক্টর রিচার!' জবাব না পেয়ে মাথা নাড়লো। 'হবে না। ভাঙতে হবে।'

সকলে মিলে কাঁধ লাগিয়ে ঠেলা দিলো, ধাক্কা দিলো। লাভ হলো না। ভারি একটা শাবল খুঁজে নিয়ে এলো একজন গার্ড। অনেক চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত খুলতে পারা গেল। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো ওরা। ঠিক এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এলো আকরাম।

'এই, কোথায় ছিলে তুমি···,' সুজা বললো।

ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে এগিয়ে গেল আকরাম। থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ডক্টর রিচার!'

ডেস্কের ওপর মাথা রেখে পড়ে আছেন ডক্টর। তাঁর পাশে একটা খাঁচা, তাতে অস্ট্রেলিয়ার অফিসিয়াল সীল মারা। খোলা পড়ে আছে খাঁচাটা। শূন্য। ডালার ওপর রক্তলাল কালি দিয়ে স্টেন্সিল করে আঁকা মানুষের হাড়ের ক্রসের ওপর খুলি—হাই ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক খুঁটিতে যেমন থাকে। নিচে ইংরেজিতে লেখা —বিপজ্জনক : বিষধর সাপ!

ডিক ফিরে এসেছে। দৃশ্য দেখে নীল হয়ে গেছে ঠোঁট, মৃদু মৃদু কাঁপছে।'

'শুনছেন, ডক্টর?' হাত ধরে নাড়া দিলো আকরাম। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে। সাড়া না পেয়ে কব্জির কাছে নাড়ি দেখলো। 'সর্বনাশ! সাপের কামড়ের লক্ষণ!' খালি খাঁচাটার

দিকে চেয়ে ঢোক গিললো, চোখে আতংক। 'নিশ্চয় সাপ ছিলো এর মধ্যে! পালিয়েছে!'

'টাইগার স্নেক!' বিড়বিড় করলো রেজা। 'পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ!'

অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো। শুধু দূরাগত একটা ফ্যানের ঝিরঝির কানে আসছে।

'সাহায্য দরকার,' টেলিফোনের দিকে এগোলো সুজা। হাত বাড়াতেই থাবা পড়লো বাহুতে। সরিয়ে দিলো আকরাম। হ্যাঁচকা টানে নিয়ে চলে এলো টেবিলের কাছ থেকে।

'কি, আকরাম···!' থেমে গেল সুজা।

আঙুল নেড়ে দেখালো আকরাম।

হাঁ হয়ে গেল সুজা। দেখেছে।

ডেস্কের ঠিক মাঝখানে একগাদা কাগজ। ওপরের কাগজগুলো নড়ছে।

দুই

স্তব্ধ হয়ে দেখছে সবাই। ওপরের দিকে চেয়ে হেসে উঠলো রেজা। 'বাতাস। ডেস্কের ওপরের ভেন্টিলেটার দিয়ে আসছে।'

আকরামের দিকে তাকালো সুজা। সুস্থির হতে পারেনি এখনও আকরাম। এখানে ওখানে ঘুরছে চঞ্চল দৃষ্টি, ঘরের কোণে, আনাচে-কানাচে।

'মিস্টার ককে ডেকে আনি,' বললো একজন গার্ড। 'অ্যাম্বুলেন্সের জন্যেও পাঠাতে হবে।'

'মিস্টার কক?' আকরামকে জিজ্ঞেস করলো রেজা।

তাদের সবাইকে বাইরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো আরেক গার্ড।

'রিচারের অ্যাসিসটেন্ট,' আকরাম জানালো। 'সাপ বেশির ভাগ সে-ই ঘাঁটাঘাঁটি করে।'

আকরামের বাহুতে হাত রাখলো সুজা। 'তুমি এতোক্ষণ কোথায় ছিলে? হয়েছে কি?'

'হয়েছে অনেক কিছুই,' সুজার হাত সরিয়ে দিলো আকরাম।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললো। 'চাকরি খুইয়েছি। রিচার বলার পর থেকেই মাথা গরম হয়ে গেছে আমার। ঘুরেছি, আর ভেবেছি।'

জেমস কক এলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অ্যাম্বুলেন্সের লোক-জন। বললেন, 'আপনারা সব বাইরে দাঁড়ান। আমি না ডাকলে ঢুকবেন না। দেখি আগে, সাপটা কোথায় গেল। নইলে আবার কাউকে কামড়াবে।'

পেশাদার লোক, মনে মনে স্বীকার করতেই হলো সুজাকে। লম্বা, কৃশকায়, পাতলা হয়ে আসা চুল, মানুষটাকে দেখে মনেই হয় না বিষাক্ত সাপ ঘাঁটতে পারে। ছয় ফুট লম্বা লাঠির মাথায় লাগানো স্নেক হুক হাতে নিয়ে সারা ঘরটা সাবধানে খুঁজলেন তিনি। 'নেই।' ঘোষণা করলেন। 'চলে গেছে।'

'চলে গেছে?' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো সুজা। পেছনে রেজা, তার পেছনে আকরাম। 'কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কক। 'কি জানি। হয়তো দরজা খোলা রেখে-ছিলেন মাইকেল। বদ্ধ জায়গা থেকে পালানোয় ওস্তাদ সাপেরা। তোমার নাকের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, টেরই পাবে না।' শুকনো হাসলেন তিনি। 'তোমরা দরজা খোলার পরই হয়তো বেরি-য়েছে। আরও যে কাউকে কামড়ায়নি, এতেই আমি খুশি।'

এক কোণে লাঠিটা ছুঁড়ে ফেললেন কক। 'দামি একটা সাপ বেরিয়ে গেল। সবচেয়ে বিষাক্ত। ভয়ের ব্যাপার। কাকে যে কখন···,' কথা শেষ না করেই দরজায় দাঁড়ানো গার্ডকে ডেকে বললেন তিনি, 'জলদি খুঁজে বের করতে হবে। সবাইকে গিয়ে বলো, দেখলে যেন সরে থাকে। আমাকে ডাকে। একা একা

মাতব্বরী করতে গিয়ে কামড় খেয়ে না মরে।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন। 'ওই যমদূতকে একা ধরার সাহস আমারও নেই। তবু কি আর করা। আর তো কেউ পারবে না।'

স্ট্রেচারে তোলা হলো রিচারকে। বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুমতিপত্র সই করে দিলেন কক। ডাক্তারকে বয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল হাসপাতালের লোকেরা।

'কোথায় নিচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'ইউনিভারসিটি মেডিক্যাল সেন্টার,' জবাব দিলেন কক। 'বেপোর্টে সাপের কামড়ের চিকিৎসা হয় একমাত্র ওই হাসপাতালে।' আবার নিষ্প্রাণ হাসলেন। 'বড়জোর মাইল দুয়েক হবে এখান থেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারের হাতে পড়বেন রিচার।'

'রেজা, তোমাদের গাড়িতে আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে?' অনুরোধ করলো আকরাম। 'আমি শিওর হতে চাই...,' দ্বিধা করলো সে। 'হয়তো তাঁর উপকারে লাগবো।'

'অতো ভেবো না,' সান্ত্বনা দিলেন কক। 'দোষটা তোমার নয়।' দরজা পর্যন্ত ছেলেদের এগিয়ে দিলেন তিনি। 'এদিকটা গুছিয়েই আমি যাবো হাসপাতালে।'

দ্রুত পার্কিং লটে চলে এলো তিনজনে।

'অদ্ভুত লাগছে!' ড্রাইভিং সিটে বসে বললো রেজা। 'গেল কোথায় সাপটা? ডক্টরের অফিসে জানালা নেই, দরজাটাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। সাপটা ভেতরেই থাকার কথা।'

'স্পোর্টস কারটায় করে চলে গেছে হয়তো,' রসিকতা করলো

সুজা। 'ওই যে আগুনরঙা গাড়িটা তখন···আরি, নেই তো।'

'দেখো, আমি সিরিয়াসলি বলছি,' গম্ভীর হয়ে বললো রেজা। 'আর রিচারের দরজায় তালাই বা ছিলো কেন?' এঞ্জিন স্টার্ট দিলো সে।

'আরও অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি আমি,' আকরাম বললো। 'অফিসের ভেতরে কেমন গুমোট লাগছিলো। অথচ ল্যাবরেটরিতে তাপমাত্রার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে এখানকার বিজ্ঞানীরা। সাপ নিয়ে কারবার তো। অফিসে একরকম ছিলো, ল্যাবরেটরিতে আরেক রকম।'

'ব্যাপারটা তো তাহলে রহস্যময়,' কৌতূহলী হলো সুজা। 'তবে সবচেয়ে রহস্যময় হলো ওই সাপ গায়েব হয়ে যাওয়াটা।'

হাসপাতালে পৌঁছলো ওরা। পথ দেখিয়ে ওদেরকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে এলো একজন নার্স। দরজায় দাঁড়িয়ে এক মহিলা, পাতলা ফ্যাকাশে মুখ, খাটো করে ছাঁটা ধূসর চুল। পুরনো ফ্যাশনের চশমা নেমে চলে এসেছে নাকের ডগায়। চশমার ওপর দিয়ে ছেলেদের দিকে তাকালেন। 'আরে, খান? আবার পুড়েছো নাকি?'

বন্ধুদের জানালো আকরাম, সোলডারিং আয়রন দিয়ে একবার হাত পুড়িয়ে ফেলেছিলো সে, তখন ডাক্তার বিগল হাজির ছিলেন চিড়িয়াখানায়। মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন।

'না, ডাক্তার। ডক্টর রিচারের খবর জানতে এসেছি। কি মনে হয়?'

'আমিও তাই জানতে এলাম,' পেছন থেকে বললেন কক।

কখন এসেছেন, বুঝতে পারেনি ছেলেরা।

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'এখনি কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে অবস্থা খুব খারাপ।'

'কথা বলা যাবে?' উৎকণ্ঠা ঢাকতে পারছে না আকরাম। 'কি হয়েছিলো জিজ্ঞেস করতাম।'

'আমিও করতাম,' বললেন মিস বিগল। 'কি ঘটেছিলো, জানা যেতো।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকালেন কক। 'সাপের কামড় নয়।'

আস্তে মাথা ঝোঁকালেন ডাক্তার। 'হয়তো।'

'দাঁতের দাগ নেই?' আকরাম জানতে চাইলো।

মেঘ জমলো ডাক্তারের চেহারায়। নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, 'এই জায়গায় ফুটো আছে। সাপের দাঁতের মতোই লাগে, তবে মোটে একটা।'

'এক-দেঁতো সাপ!' সুজা অবাক।

দ্বিধা করলেন ডাক্তার। 'মাঝেসাঝে দাঁত পড়ে যায় সাপের, কিংবা ভেঙে যায়। কিন্তু শীঘ্রি গজিয়ে যায় আবার। যেটা কামড়েছে, সেটার কি একটা ছিলো?'

'জানি না,' কক বললেন। 'নতুন এসেছে। দেখার সময়ই পাইনি। তবে, যারা পাঠায় ভালোমতো দেখেই পাঠায়। খারাপ মাল হলে পাঠায় না। তাছাড়া,' এক এক করে চারজনের মুখের দিকেই তাকালেন তিনি, 'সাপের শরীরে অ্যান্টিবডি নেই। সামান্য কেটে গেলেই ইনফেকশনে মারা যেতে পারে। কাজেই, দাঁত ছাড়া জখমী সাপ পাঠানোর কথা নয়।'

ইশারায় সকলকে আসতে বলে অফিসের দিকে চললেন ডাক্তার। ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসলেন চেয়ারে। 'কক, অফিসে সাপ-টাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন রিচার?'

'বলতে পারবো না। সাপ পরীক্ষা করার জন্যে বিশেষ জায়গা আছে ল্যাবরেটরিতে। সেখানে নিয়েই দেখি আমরা। আর, গর্দভ ছাড়া একটা টাইগার স্নেককে একা বাক্স থেকে বের করতে যাবে না কেউ।' জোরে মাথা নাড়লেন সর্প-সহকারী। 'রিচার আর যাই হোন, বোকা নন।'

চশমা খুলে চোখ ডললেন ডাক্তার। 'আর ঘাড়েই বা কামড় খেলেন কিভাবে?'

'ঠিক,' কথাটা ধরলো রেজা, 'সাপ ছোবল মারে নিচের দিকে। ওপরে দাগ গেল কিভাবে?'

'হয়তো ঝুঁকে খাঁচাটা খুলছিলেন ডক্টর,' আকরাম বললো। 'সেই সময় হঠাৎ বেরিয়ে এসে ছোবল মেরেছে।'

'হয়তো,' বললেন কক। 'খাঁচা খোলার জন্যে ঝুঁকলে মাটি থেকে রিচারের ঘাড় পাঁচ ফুট ওপরে থাকার কথা। সাপটা আট ফুট। নাগাল পেতেই পারে। কপাল ভালো ওর, সাপের বিষ হজম করার ক্ষমতা আছে। নইলে এতোক্ষণে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।'

'সাপের বিষ হজম?' সুজা বুঝতে পারছে না।

উঠে পায়চারি শুরু করলেন মিস বিগল। 'সাপের বিষের প্রতি মৃদু ইমমিউনিটি তৈরি করা সম্ভব। খুব সামান্য পরিমাণ বিষ রক্তে ঢুকিয়ে দিয়ে সহ্য করিয়ে নিতে হয়, ধীরে ধীরে বাড়াতে হয় বিষ ঢোকানোর মাত্রা। তাতে ইমমিউনিটি তৈরি হয়। সাধা-

রণ বিষে আর তখন কিছু হয় না, এমনকি মারাত্মক বিষও সহ্য করে টিকে থাকতে পারে অনেকক্ষণ।'

'তারমানে, রিচার বাঁচবেন?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'কে জানে?' ডাক্তারের দুই ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়লো। 'সাপের কামড় খেয়ে আগেও এসেছিলেন, চিকিৎসা করেছি, সেরেও উঠেছেন। কিন্তু এবারের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছি না। সাড়া দিচ্ছে না শরীর।' টেবিলে চাপড় মারলেন তিনি। 'কেন?'

'অ্যান্টিভেনম দেয়া যায় না?' সুজা পরামর্শ দিলো।

'অ্যান্টিভেনিন,' শুধরে দিলেন ডাক্তার। 'টাইগার স্নেকেই কামড়েছে, শিওর হতে পারলে তা-ই দিতাম। ভুল ওষুধ দিলে ভালো না হয়ে ক্ষতিও হতে পারে, এমনকি মৃত্যু। প্রথমে সাপটাকে দেখতে চাই আমি। দেখতে চাই, ওটার একটাই দাঁত কিনা।'

উঠে দাঁড়ালেন কক। 'যাই, খোঁজায় সাহায্য করিগে। রিচারের কোনো পরিবর্তন হলেই আমাকে জানাবেন, ডাক্তার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন মিস বিগল।

তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন কক।

'সাপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন,' সুজা বললো।

'হ্যাঁ, জাত-সাপুড়ে,' বললেন ডাক্তার। 'রিচারও জাত-সাপুড়ে, তবে দু'জনের স্বভাব দু'রকম। কক শান্ত, সাপের মতোই ঠাণ্ডা। রিচার ঠিক উল্টো, বদমেজাজী, শান্ত হতেই যেন জানেন না।' আকরামের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'তোমার নিশ্চয় এসব শুনতে ভাল্লাগছে না?'

মাথা নাড়লো আকরাম।

ফোন বাজলো। রিসিভার তুললেন ডাক্তার। নীরবে শুনলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'বুঝেছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।' রিসিভার রাখতে রাখতে ছেলেদের বললেন, 'রিচারের অবনতি হচ্ছে। এখনি যাচ্ছি আমি।'

ঘড়ি দেখলো সুজা। 'দুপুর তো হয়ে এলো। দাদা, চলো, ক্যাফিটেরিয়ায় কিছু খেয়ে নিই।' মিস বিগলকে বললো, 'আমাদের সাহায্য লাগলে জানাবেন।'

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে দ্রুত চলে গেলেন ডাক্তার।

হাসপাতালের ক্যাফিটেরিয়ায় চললো ছেলেরা।

স্যাণ্ডউইচ খাওয়া সবে শেষ করেছে, এই সময় সেখানে এসে হাজির হলেন ডাক্তার বিগল। 'আরও খারাপ হচ্ছে,' ভোঁতা কণ্ঠে জানালেন তিনি। 'অ্যান্টিভেনিন দরকার। কিন্তু চিড়িয়াখানা থেকে এখনো পাইনি। মনে হয় সবাই সাপ খুঁজতে বেরিয়েছে। তোমরা গিয়ে এনে দিতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারবো,' পেছনে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো রেজা। 'কয়েক মিনিট। এই যাবো আর আসবো।'

পকেট থেকে কাগজ বের করে খসখস করে কিছু লিখলেন ডাক্তার। 'স্টোরের চার্জে যে-ই থাকে, তাকে দেখিও। দিয়ে দেবে।'

'এই, চলো,' বলে ভ্যানের দিকে দৌড় দিলো রেজা।

ওরা চিড়িয়াখানায় পৌঁছে দেখলো, স্টাফ আর গার্ডেরা ছড়িয়ে পড়েছে। সাপ খোঁজায় ব্যস্ত।

'আরে,' গেট পেরিয়ে এসে বললো আকরাম, 'সিকিউরিটি

সিসটেম অফ করে দিয়েছে। গেট খোলা।'

'কেন দিলো?' সুজার প্রশ্ন।

'ওই যে, এতো লোককে ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। বার বার অ্যালার্ম বাজতে থাকবে, সেই জন্যে হয়তো।' ডিককে দেখে বললো, 'স্টোরের চাবি হয়তো তার কাছেই।' কয়েক পা এগিয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাকলো।

'আসতে পারবো না,' ডিক বললো। 'এদিকে অসুবিধা।'

ছেলেরাই এগিয়ে গেল। ডাক্তারের নোট ডিকের হাতে দিলো রেজা। 'এই ওষুধটা এখুনি চেয়েছেন।'

একনজর দেখেই বলে উঠলো ডিক, 'এসো। বিষ আর অ্যান্টি-ভেনিন একই জায়গায় রাখি, ডক্টর রিচারের অফিসের পাশের ঘরে।' তাড়াতাড়ি ওদেরকে নিয়ে চললো সে। একটা খোলা দরজার সামনে পৌঁছেই থমকে গেল।

তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো ছেলেরা। বিষ আর অ্যান্টি-ভেনিন রাখার তাকগুলো খালি। একটা শিশি কিংবা জার, কিচ্ছু নেই।

গুঙিয়ে উঠলো ডিক। 'আবার চুরি! এরপর কি ঘটবে?'

'চুরি?' অবাক হয়ে বললো রেজা। 'কি বলছেন?'

'কথাটা গোপন রাখা হয়েছে,' ডিক বললো। 'শুধু টাইগার-টাকেই খুঁজছি না আমরা। আরও কিছু সাপ গায়েব। মারাত্মক বিষধর কিছু সাপ চুরি করে নিয়ে গেছে, কিংবা ছেড়ে দিয়েছে।'

'এখুনি ডাক্তার বিগলকে ফোন করা দরকার,' বললো আক-রাম। 'রিচারের জীবন নির্ভর করছে অ্যান্টিভেনিনের ওপর।'

মাথা ঝোঁকালো রেজা। 'হ্যাঁ, তাই। ডিক, ডক্টর রিচারের ফোনটা ব্যবহার করা যাবে?'

'যাবে। তোমরা করো গিয়ে। আমি মিস্টার ককের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে জানানো দরকার।'

ফোনে কথা বলছে রেজা। সুজা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরটায়। দেয়ালের কাছে বইয়ের সারি। এক কোণে একটা কম্পিউটার। টাইগার স্নেকের খাঁচাটা শূন্য পড়ে আছে ডেস্কের কাছে। বাক্সের ডালায় লেখাটা আরেকবার পড়ার জন্যে এগোতেই ভাঁজ করা একটা রঙিন কাগজ চোখে পড়লো তার। খুলে দেখলো, একটা টিকেটের ছেঁড়া অংশ। লেখা:

অ্যাডমিট ওয়ান: মাসট্যাংস ভার্সাস টি...

অকটোবর ১—টিটান স্টেডিয়াম, মি...

দুটো লাইনেরই শেষটা নেই, ছিঁড়ে ফেলেছে, তবে বোঝা যায়। নিউ জারসিতে ফুটবল খেলা হয়েছিলো, সেটার টিকেট।

রিসিভার রাখার শব্দে চোখ তুলে তাকালো সুজা। রেজার মুখ থমথমে। বললো, 'লস অ্যাঞ্জেলেসের রেপটাইল রিসার্চ ইনসটিটিউটে ফোন করেছেন ডাক্তার বিগল। কাছাকাছি একমাত্র ওখানেই টাইগার স্নেকের অ্যান্টিভেনিন পাওয়া যেতে পারে। প্লেনে করে আনাতে হবে।'

'রিচারের অবস্থা কেমন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো আকরাম।

'ওষুধ আসা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন ডাক্তার। লাইফসাপোর্ট মেশিনে তুলে দেয়া হয়েছে ডক্টরকে।' সারা অফিসে

চোখ বোলালো একবার রেজা। 'দেখো অবস্থা। পারিবারিক ছবি নেই, পারসোনাল স্টাফ নেই, শুধু গবেষণার যন্ত্রপাতি। ভদ্রলোক খালি সাপ নিয়েই থাকতেন।'

'ভুল করছো, দাদা,' ভাইয়ের হাতে টিকেট-ছেঁড়াটা তুলে দিলো সুজা।

'ছেঁড়া টিকেট। তো?'

'এই অফিসের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মেলে না। বেখাপ্পা।'

'এসেছে হয়তো কোনোভাবে। কারও পকেট থেকে পড়েছে, কিংবা...'

'এখানে কে...?' দরজার কাছ থেকে বলে উঠলেন কক। 'ও, তোমরা।' নরম হলো কণ্ঠস্বর। 'চুরির কথা বলেছে আমাকে ডিক। মাথাব্যথা আরও বাড়ালো।'

চিউইং গাম বের করে মুখে পুরলেন সর্প-সহকারী। ছেলেদের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন প্যাকেটটা। 'নেবে? ইদানীং সিগারেট ছেড়েছি।' হাসলেন, কেমন যেন বোকা বোকা দেখালো হাসিটা। 'এক বদভ্যাস ছাড়তে আরেক বদভ্যাস।'

চিউইং গাম নিলো না ছেলেরা। খাবে না। আবার প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিলেন কক। আনমনে দলা পাকাচ্ছেন মোড়কটা। 'ডাক্তারের কোনো খবর আছে?'

খবর জানালো রেজা।

শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন কক। 'এখনও বেহুঁশ? খুব খারাপ। ওরকম লোকের দরকার আছে, যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে।'

'অনেকদিন কাজ করছেন তাঁর সঙ্গে, না?' সুজা জানতে

চাইলো।

শ্রাগ করলেন কক। 'কয়েক মাস। কেন?'

'হয়তো কিছু জানাতে পারবেন আমাদেরকে।' ছেঁড়া টিকেট-টা দেখালো সুজা। 'এটা এখানে এলো কিভাবে, বলতে পার-বেন?'

গাম চিবানো থামিয়ে টিকেটটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কক। 'রিচারেরই বোধহয়, সে-ই এনে ফেলেছে। ওহহো, দেরি হয়ে গেল আমার। কাজ পড়ে আছে।' দ্বিধা করলেন এক মুহূর্ত। 'তোমাদের পাসগুলো দিয়ে দাও। এমনিতেই অনেক ঝামেলা হচ্ছে এখানে, আর কোনো দুর্ঘটনা চাই না।'

হল থেকে কে যেন ডাকলো, তাড়াতাড়ি চলে গেলেন কক।

দরজায় উঁকি দিলো ডিক বনার। 'ইয়াং ম্যান, এবার তো তোমাদের যেতে হয়।'

'চুরির ব্যাপারে কি করলেন?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'কিছুই হয়নি এখনও। অ্যাণ্ডি কারসন, আমাদের সিকিউরিটি চীফকে জানিয়েছি। তিনি ফোন করেছেন পুলিশকে। তদন্ত করতে আসবে ওরা। সাপ খুঁজতেও সাহায্য করবে।' আকরা-মের কাঁধে সহানুভূতির হাত রাখলো সিকিউরিটি গার্ড। 'কাছা-কাছি থেকো, খান। ও, আমাকে যেতে হচ্ছে।' বলে প্রায় ছুটে চলে গেল।

বন্ধুর দিকে উদ্দেশ্য নিয়ে তাকালো রেজা। কিন্তু আকরাম তাকিয়ে আছে বইগুলোর দিকে, শূন্যদৃষ্টি। 'আকরাম, বাড়িতে কিছু বলে এসেছো? চিন্তা করবে না?'

'না। বাবা-মা কেউ নেই। বেড়াতে গেছে।'

'তাহলে আমাদের সঙ্গেই থাকো,' সুজা বললো।

ওরা অফিস থেকে বেরোনোর জন্যে পা বাড়িয়েছে, এই সময় প্রায় ছুটে ঢুকলো দু'জন শ্রমিক। একজন ছুটে গেল ফোনের দিকে। আরেকজন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো।

'কি ব্যাপার?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'একটা সাপ,' বললো দরজার কাছের লোকটা।

'টাইগার স্নেক?' উজ্জ্বল হলো রেজার মুখ।

মাথা নাড়লো লোকটা। 'জানি না।'

'কোথায়? বনের ভেতর?' আকরাম জানতে চাইলো।

'না। এখান থেকে ছয় ব্লক দূরে একটা ধোপার দোকান থেকে ফিরছিলো এক মহিলা। পথে একটা বাচ্চাকে বিরাট এক সাপ নিয়ে খেলতে দেখেছে, এক বাড়ির পেছনে। আজ সকালে চিড়িয়াখানা বন্ধ করা নিয়ে এমনিতেই কানাঘুষা চলছিলো, এখন জানাজানিই হয়ে গেল ব্যাপারটা···ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে অবশ্য। কিন্তু এসব খবর কি আর চাপা থাকে? গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সব বলছে মহিলা।'

'ছেলেটাকে কামড়েছে নাকি?'

'জানি না। ব্যাক,' ফোন করছে যে লোকটা, তাকে দেখালো শ্রমিক,'কারসনকে ফোন করছে। ওখানে লোক পাঠানোর জন্যে। গিয়ে দেখে আসুক কি হয়েছে।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সে। 'কি যে অবস্থা হবে! আধডজন সাপ বেরিয়ে গেছে। আবহাওয়াও গরম থাকবে না, রাতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'তাতে কি ?' সুজা বললো।

কালো হয়ে গেল লোকটার মুখ। 'সাপের রক্ত ঠাণ্ডা। ফলে শীত সহ্য করতে পারে না। ঠাণ্ডা পড়লেই লুকানোর জন্যে গরম জায়গা খোঁজে। এই যেমন বাড়িঘর···

'ধোবাখানা,' ফোন রেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো ব্যাক। 'ওখানে বেশি গরম।···ওরা রওনা হচ্ছে, মিস্টার ককও সঙ্গে যাচ্ছেন। ওই লণ্ড্রি থেকেও নাকি ফোন করেছে,' ফ্যাকাশে হয়ে গেছে লোকটা। 'আরও একজন দেখেছে সাপটাকে। বললো, লম্বায় আট ফুটের কম না।'

চমকে উঠলো আকরাম।

পরস্পরের দিকে তাকালো রেজা আর সুজা।

টাইগার স্নেকটাও আট ফুট লম্বা।

তিন

অস্থির হয়ে উঠলো আকরাম। 'আমাদের কিছুই করার নেই?'

মাথা নাড়লো ব্যাক। ঘড়ি দেখলো। 'এতোক্ষণে নিশ্চয় চলে গেছেন মিস্টার কক। কিছু জানলে ফোন করে জানাবেন।'

ধীরগতিতে গড়িয়ে চললো যেন সময়। অবশেষে ফোন বাজলো। ছোঁ মেরে তুলে কানে ঠেকালো ব্যাক। নীরবে শুনলো ওপাশের কথা। হাসি ফুটলো মুখে। 'ডরি? আজ এই প্রথম সুসংবাদ শোনালে। থ্যাংক ইউ।' আস্তে রিসিভার রেখে দিলো সে।

'কী?' তর সইছে না সুজার।

হাসলো ব্যাক। 'আমাদের একটা সাপই। তবে ডরি, ভয়ের কিছু নেই।'

'ডরি?' রেজা বললো। 'ডরিটা আবার কে?'

'সাপটার নাম। আট ফুট লম্বা একটা রাজগোখরো।'

'রাজগোখরো? ধোবাখানায়?' দুশ্চিন্তা কাটেনি আকরামের।

'ছেলেটাকে···

হাসি মুছলো না ব্যাকের। 'না, কামড়ায়নি। কিছুদিন আগে এক সার্কাস পার্টির কাছ থেকে কেনা হয়েছে সাপটা। ওটাকে দিয়ে খেলা দেখাতো। বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছে। মস্ত, কুৎসিত ওই সাপটা এখন···'

'নির্বিষ,' বাক্যটা শেষ করে দিলো তার সঙ্গী। 'মানে বিষ-থলিতে বিষ থাকলেও সেটা রক্তে ঢোকাতে পারে না আরকি। কামড়াতে পারে না। যাক, বাঁচা গেল।'

ভ্রূকুটি করলো ব্যাক। 'গেল, এবারকার মতো। তবে···,' কথাটা শেষ করলো না সে। কিন্তু ঘরের সবাই বুঝলো, কি বলতে চায়। কারণ, টাইগার স্নেকটাকে এখনও পাওয়া যায়নি।

ঘর থেকে বেরোতে যাবে সবাই, দরজা জুড়ে দাঁড়ালো বিশাল বপু। মিস্টার ড্রেক ডানকান, বেপোর্টের পুলিশ চীফ। রেজা-সুজাকে ভালো করেই চেনেন, ওদের বাবা ফিরোজ মুরাদের বিশিষ্ট বন্ধু তিনি। বাবার মতোই ছেলেরাও গোয়েন্দা হতে চায়, জানেন। ওদের দেখে খুশিই হলেন। 'আশা করছিলাম সাপুড়ে দেখবো, এখন দেখি আমাদের দুই বিখ্যাত খুদে টিকটিকি,' দুই ভাইয়ের দিকে চেয়ে সস্নেহ হাসলেন তিনি।

পেছনে উঁকি দিলেন কক, তাঁর পেছনে আরেকটা মুখ। ইউনি-ফর্মই বলে দিলো, সঙ্গের লোকটি অ্যাণ্ডি কারসন, চিড়িয়াখানার সিকিউরিটি চীফ। ল্যাবরেটরিতে পুলিশের আনাগোনা বোধহয় পছন্দ হলো না ককের। কারসনের দিকে চেয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হচ্ছে এখানে? ইনি কে?'

'আমি ড্রেক ডানকান, রেপোর্টের পুলিশ চীফ,' নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন পুলিশ অফিসার। 'আপনি কে?'

'আমি জেমস কক, এখানকার ইনচার্জ। আপনি এখানে ঢুকেছেন কেন?'

'মিস্টার কক,' এগিয়ে এলেন কারসন, 'পুলিশকে আমি ফোন করেছি।'

'তুমি? কেন?' ফেটে পড়লেন কক। 'একদল ভোঁতামুখো খাকিপোশাক এখানে কি করবে? চোর ঠ্যাঙানো এককথা, আর জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে ব্যবহার আরেক। এখানে ওরা কি করবে?'

রাগ ঢাকতে পারলেন না কারসন। 'চুরি হয়েছে, স্যার। অবস্থা খুব খারাপ।'

জবাবে কড়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কক, ষাঁড়ের মতো গোঁ গোঁ করে উঠলেন ডানকান। সাগর কলার মতো মোটা আঙুল নেড়ে বললেন, 'আপনি থামুন তো!' কারসনের দিকে ফিরে বললেন, 'খুলে বলুন সব। কিচ্ছু বাদ দেবেন না।' ককে হুঁশিয়ার করলেন, 'কথার মাঝে আর আপনি কথা বলবেন না, বলে দিলাম।'

দ্রুত চীফকে সব কথা জানালেন কারসন। রিচারের দুর্ঘটনা থেকে সাপ গায়েব হয়ে যাওয়ার কথা পর্যন্ত, সব।

'সাপের বিষও চুরি?' ডানকান বললেন।

'শুধু বিষ না, স্যার। অ্যান্টিভেনিনও।'

'প্লাস আধডজন সাপ। হুঁ, পরিস্থিতি সত্যি মারাত্মক। এতোটা আশা করিনি। সাপগুলো এখন কোথায় আছে জানার উপায়

নেই। গর্তে থাকতে পারে, লোকের বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে পারে। কিংবা চুরিও হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সাপ চুরি করতে আসবে কে?'

'আমি বুঝতে পারছি না, চিড়িয়াখানার এতো লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এভাবে গায়েব হলো কি করে সাপগুলো?'

'ভালো প্রশ্ন,' বলে উঠলো আরেকটা কণ্ঠ। 'কি করে গায়েব হলো? কিংবা কিভাবে চুরি হলো? তো আপনি এখন কি করতে চান, মিস্টার ডানকান?'

একসঙ্গে ঘুরে গেল সব ক'টা চোখ।

কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ডানকান, 'কে আপনি?'

দামি পোশাক পরা, ব্যায়াম-পুষ্ট একজন মানুষ এগিয়ে এলো। মাথায় লাল চুল। 'আমি হেনরি মরগান। নাম নিশ্চয় শুনেছেন। নিউ.ইয়র্কের কিছু বিশিষ্ট পত্রিকায় খবর সাপ্লাই দিই। মনে হচ্ছে এখানে খুব গরম খবর আছে।'

সরু হয়ে এলো চীফের চোখ। 'মরগান।' মাথা চুলকালেন তিনি। 'প্লাস্টিক কেলেঙ্কারির সেই রিপোর্টটা আপনিই লিখেছিলেন না? আর বারমেট বে-তে বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার গল্প?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই অধম,' হাসলো মরগান। 'এখন আমি রেপোর্ট চিড়িয়াখানা থেকে সাপ উধাওয়ের রিপোর্ট শুরু করেছি। শহরে ছড়িয়ে পড়ছে বিষাক্ত সাপ। লোকের জানার অধিকার নিশ্চয় আছে, কখন, কোথায় তারা কামড় খাবে।' একটা টেপ রেকর্ডারের মাইক্রোফোন ডানকানের নাকের নিচে ঠেলে দিলো রিপোর্টার।

'আমরা·· ইয়ে, মানে···আমি···মানে···,' কথা হারিয়ে ফেলেছেন যেন দুর্ধর্ষ পুলিশ অফিসার। তাঁর গোল লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে। লম্বা দম নিয়ে সাহস সঞ্চয় করলেন বুঝি, গমগমে ভারি কণ্ঠে বললেন, 'সাপগুলো খুঁজে বের করার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা চালাবো আমরা। এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি, যাতে জোর দিয়ে বলা যায় সাপগুলো শহরেই ঢুকে পড়েছে। এমনও হতে পারে, কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে, তার বাড়ির মাটির তলার ঘরে এখন ওগুলো বাক্সবন্দি রয়েছে···'

'প্রমাণ নেই, না?' ধমকের সুরে বললো রিপোর্টার। 'কি প্রমাণ চান? টাইগার স্নেকের মতো ভয়ংকর বিষাক্ত একটা সাপ ছুটে গেছে, কামড় খেয়ে হাসপাতালে এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ডক্টর ডোনাল্ড রিচার। এখান থেকে মাত্র ছয় ব্লক দূরে ধোবাখানায় গিয়ে ঢুকেছিলো একটা কালকেউটে, ধরে আনা হয়েছে এইমাত্র, আরেকটু হলেই ছয় বছরের একটা বাচ্চাকে দিয়েছিলো শেষ করে। এরপরও আর কি প্রমাণ লাগে?' বরফের মতো শীতল হয়ে উঠলো তার কণ্ঠ। 'আপনার কি মনে হয়, চীফ? বাচ্চাটা মারা গেলে তবেই আপনি তাকে প্রমাণ বলতেন?'

বিচিত্র শব্দ বেরোলো চীফের নাক দিয়ে, যেন স্পার্কিং প্লাগে ময়লা জমে যাওয়ায় ফটফট করে বিগড়ে যেতে চাইছে দমকলের এঞ্জিন। জবাব তৈরি করে বলার আগেই ঝটকা দিয়ে তাঁর সামনে থেকে মাইক্রোফোন সরিয়ে আনলো মরগান, ধরলো কারসনের মুখের কাছে। 'আপনি? আপনি এই চিড়িয়াখানার সিকিউরিটি

ইনচার্জ, রাইট ?'

মাথা ঝাঁকালেন কারসন, অস্বস্তি বোধ করছেন।

'আপনিই তাহলে ওই সাপগুলো ছুটে যাওয়ার জন্যে দায়ী ?' আবার প্রশ্ন করলো রিপোর্টার।

ফাঁদে পড়ে যাওয়ার ভয়ে মাইক্রোফোনের কাছ থেকে সরে এলেন বেচারা সিকিউরিটি চীফ। কিন্তু মরগান ছাড়লো না তাঁকে, আবার নাকের নিচে মাইক্রোফোন নিয়ে গিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে লাগলো। পিছাতে পিছাতে অফিসের এককোণে গিয়ে ঠেকলেন কারসন।

ওদেরকে দুরে সরে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডানকান। 'ওকে ঢুকতে দিলো কে এখানে ?' কেউ জবাব দিতে পারলো না। শ্রাগ করলেন চীফ। নিজের লোকদের আদেশ দিতে শুরু করলেন, সার্চপার্টি তৈরি করে সাপ খুঁজতে যাওয়ার জন্যে।

সুজার দিকে তাকালো রেজা, চোখে বিস্ময়। নিচু কণ্ঠে বললো, 'কিছু বুঝতে পারছি না। সাপ চুরি করবে কে ? সেই সঙ্গে বিষ, অ্যান্টিভেনিন ? নাহ্, বোঝা যাচ্ছে না।'

'আর বেরই বা করলো কিভাবে ?' আরেকটা প্রশ্ন যোগ করলো সুজা।

ভারি গুঞ্জন শোনা গেল। ডক্টরের ডেস্কের ওপর বয়ে গেল একঝলক বাতাস। কাগজ ওড়ালো। মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলো একটা কাগজ, ধরে ফেললো রেজা, ওটা পেপারওয়েট চাপা দিতে দিতে তাকালো সিলিঙের দিকে। তুড়ি বাজালো, 'তাহলে এই ব্যাপার।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো সে।

সুজাও তাকালো। চেঁচিয়ে উঠলো সে-ও, 'নিশ্চয়ই! দরজায় তালা, জানালা নেই···এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

'এই, কি বলছো তোমরা?' ছেলেদের কথায় আকৃষ্ট হলেন চীফ। 'কিসের ব্যাখ্যা?'

'কি করে চুরি করেছে অনুমান করতে পারছি,' রেজা বললো। ডেস্কের ওপরে সিলিঙে বিশাল ভেন্ট দেখালো সে, বাতাস চলাচলের পথ।

একবার দেখেই ফিরলেন চীফ। তাঁর একজন লোককে বললেন, 'মাইক, উঠে দেখে এসো তো।'

'আ-আমি···,' ভয়ে ভয়ে ভেন্টের দিকে তাকালো পুলিশম্যান।

'হ্যাঁ, তুমি!' গর্জে উঠলেন ডানকান। ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া লোকটার দিকে চেয়ে অবাক হলেন। 'কি হলো তোমার?'

'সাপ, স্যার। ওখানে সাপ থাকতে পারে। সাপ সামলাতে পারে ওরকম কাউকে পাঠালে···!'

'মাইক, যাও। এটা অর্ডার!'

ঢোক গিললো মাইক, মাথা ঝাঁকালো, করুণ হয়ে উঠেছে চেহারা। বেরিয়ে গেল মই আর স্ক্রু-ড্রাইভার আনার জন্যে। খানিক পরেই ফিরে এলো টর্চলাইট আর টুলবেল্ট হাতে নিয়ে। পেছন পেছন এলো চিড়িয়াখানার একজন শ্রমিক, কাঁধে মই।

স্ক্রু-ড্রাইভার ঢুকিয়ে চাড় দিতেই খুলে গেল ভেন্টের কব্জা লাগানো ধাতব জাফরি।

সেদিকে চেয়ে বললেন ডানকান, 'তোমার থিওরি মানা যাচ্ছে

না, রেজা। জাফরির স্ক্রুগুলো এপাশে। ওপাশ থেকে কি করে খুলবে?'

'ভালো করে দেখুন, চীফ, স্ক্রু নয় ওগুলো। এক ধরনের হুড়কো। ওপাশ থেকে খোপ দিয়ে হাত ঢুকিয়েই খুলে ফেলা সম্ভব।'

এগিয়ে এসে আরও কাছে থেকে দেখলেন চীফ। মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। ওপাশের শ্যাফটটা দেখে এসো, মাইক।'

দ্বিধা করছে মাইক। ডানকান আরেকবার গর্জন করে উঠতেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোকরে মাথা গলালো সে। থামলো। তারপর উঠতে শুরু করলো মইয়ের ধাপ বেয়ে, উঠে গেল শেষ ধাপে। শরীরের অর্ধেকটা এখন ফোকরের ভেতরে।

হঠাৎ তার বিস্মিত চাপা চিৎকার চমকে দিলো সবাইকে।

ধীরে ধীরে ফোকর থেকে নেমে এলো মাইক। রুমাল দিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে কি যেন। আরও নিচে নামলে দেখা গেল, কালো হাতলওয়ালা একটা স্ক্রু-ড্রাইভার। বললো, 'কেউ ছিলো ওখানে, কোনো সন্দেহ নেই। ধুলোর মধ্যে তাজা চিহ্ন দেখলাম। ভেন্টের কয়েক ফুট ভেতরে পড়ে ছিলো এই স্ক্রু-ড্রাইভারটা।'

'দেখি তো,' মাইকের হাত থেকে সাবধানে জিনিসটা নিলেন চীফ, রুমালে চেপেই। যাতে আঙুলের ছাপ মুছে না যায় হাতল থেকে। দেখে আবার ফিরিয়ে দিলেন সহকারীর হাতে, মাইকের আঙুল তখনও মৃদু কাঁপছে। চীফ বললেন, 'ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। আঙুলের ছাপ খুঁজুক।' ককের দিকে ফির-

লেন তিনি। এতোক্ষণ ধরে নীরব হয়ে আছেন সর্প-সহকারী। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন চীফ, 'স্ক্রু-ড্রাইভারটা চিনতে পারছেন?'

রাগ করে মাথা নাড়লেন কক। 'আমি কি করে চিনবো? নাম লেখা আছে নাকি?'

'আছে,' শান্তকণ্ঠে বললেন চীফ। 'এটাতে খোদাই করা আছে, নামের আদ্যাক্ষরই হবে।'

'তাই? কার নাম?'

শ্রাগ করলেন ডানকান। 'জানি না। এটা দিয়ে যে কাজ করতো, হয়তো তার। এ. কে.। কার নাম?'

হাঁ হয়ে গেল ককের মুখ। তিনি কিছু বলার আগেই অস্ফুট শব্দ শোনা গেল দরজার কাছে। বারান্দা ধরে দৌড় দিলো কেউ আউটার ল্যাবরেটরির দিকে।

চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন ডানকান, 'ধরো, ধরো ওকে!'

থেমে গেল ছুটন্ত পদশব্দ, শুরু হলো ধস্তাধস্তি। দুদিক থেকে ধরে টানতে টানতে বেচারাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো দু'জন পুলিশ।

মাইকের হাত থেকে আবার স্ক্রু-ড্রাইভারটা নিয়ে দেখলেন চীফ। বিড়বিড় করলেন, 'এ. কে.।' তাকালেন ভীত মুখটার দিকে।

থ হয়ে গেছে রেজা আর সুজা। দৌড় দিয়েছিলো তাদের বন্ধু আকরাম। বিড়বিড় করলো রেজা, 'এ. কে.! আকরাম খান!'

চার

আকরামের হাত ধরে টানলো মাইক। 'ভালোয় ভালোয় আসবে না হাতকড়া লাগাবো ?'

বিশ্বাস করতে পারছে না রেজা আর সুজা।

'আকরাম, কি করেছো ?' জিজ্ঞেস করলো রেজা।

'কিছুই করিনি।'

স্ক্রু-ড্রাইভারটা তুলে ধরলেন চীফ। 'তোমার ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করলো বিষণ্ণ আকরাম।

ফোঁস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়লেন চীফ। 'থানায় নিয়ে চলো ওকে। জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।'

'আংকেল,' রেজা বললো, 'আপনার বিশ্বাস, আকরাম এসবে জড়িত ?'

'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু হবে না। তোমার কথায়ই ভেন্ট খুঁজলাম, নিজের চোখেই দেখলে আকরামের স্ক্রু-ড্রাইভার পাওয়া গেল। ওর বিরুদ্ধেই গেল ব্যাপারটা।'

'কিন্তু ও আমাদের সঙ্গে ছিলো,' প্রতিবাদ করলো সুজা।

'রিচার যখন চিৎকার করেছেন, তখনও কি ছিলো ?'

'না···তখন ও···অ্যাডমিনিস্ট্রেশন···।'

শুকনো গলায় বললেন চীফ, 'দেখো, আকরামকে আমিও চিনি। কিন্তু যতোক্ষণ প্রমাণ না করা যাচ্ছে, ও জড়িত নেই, ছাড়তে পারছি না।'

আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো সুজা, তাকে থামালো রেজা। 'এসো, এখানে কথা বলে লাভ হবে না। বাবাকে খবর দিই। দেখি, কি করতে পারে।'

তিন ঘণ্টা খাটাখাটনির পর আকরামের জামিন করাতে পারলেন মিস্টার ফিরোজ মুরাদ আর তাঁর উকিল মিস্টার হ্যারিস মিলার। আদালতের কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে ডিনারে বসেছে সবাই—ফিরোজ মুরাদ, হ্যারিস মিলার, রেজা, সুজা আর আকরাম। চোখমুখ কালো করে রেখেছে সে। একদম চুপ।

'ভালো বিপদে পড়েছো তুমি, আকরাম,' উকিল বললেন। 'তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ যা পাওয়া গেছে, জেলে ঢোকানোর জন্যে যথেষ্ট··।'

'কিন্তু···,' প্রতিবাদ করতে চাইলো আকরাম।

হাত তুলে থামালেন মিলার। 'আমাকে শেষ করতে দাও। তোমার বিরুদ্ধে কেস খাড়া করার চেষ্টা করবে এখন পুলিশ। ওই দৌড়টা দিয়েই খারাপ করেছো।'

অসহায় ভঙ্গিতে চারপাশে তাকালো আকরাম। যেন এই জাল থেকে বেরোনোর পথ খুঁজছে। 'আপনি ভালো করেই জানেন, আমি সাপ চুরি করিনি।'

নড়েচড়ে বসলেন মিস্টার মুরাদ। 'দৌড়টা দিলে কেন?'

বুকের ওপর ঝুলে পড়লো আকরামের মাথা। 'আমি···স্ক্রু-ড্রাইভারটা দেখে মাথা গরম হয়ে গেল। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম।'

বন্ধুর বাহুতে সান্ত্বনার হাত রাখলো রেজা। 'এখানে কেউ আমরা তোমাকে চোর ভাবছি না। তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যেই সব কথা জানতে চাইছেন মিলার আংকেল।'

'আকরাম,' সুজা জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা ভেন্টের মধ্যে গেল কি করে, বলো তো?'

হাত নাড়লো আকরাম। 'কি করে বলি? আমার টুলবক্সে ছিলো। সাপের খাঁচাটা বানানোর সময়ও ছিলো বাক্সে. আমি শিওর। ইস্, কেন যে কাজটা নিলাম!'

নরম গলায় মিস্টার মুরাদ বললেন, 'আকরাম, আসল কথাটাই এখনও তোমাকে বলেনি হ্যারি।'

'আসল কথা?'

'ডক্টর রিচার মারা গেলে, তুমি সাংঘাতিক বিপদে পড়বে,' শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি।

'শোনো,' ছোট্ট কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন মিলার, 'বুঝিয়েই বলি। ধরো, রিচার মারা গেলেন। আর পুলিশ প্রমাণ করে ফেললো, একটা অপরাধ ঘটার সময় তিনি আহত হয়েছেন। অপরাধ মানে ওই চুরির কথাই বলতে চাইছি আরকি আমি। খুনের দায় চাপবে তোমার ঘাড়ে।'

'খুন!' আঁতকে উঠলো সুজা।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরলো আকরাম।

তার কাঁধে হাত রাখলেন মিস্টার মুরাদ। 'আকরাম, মাথা গরম করো না। তোমাকে বাঁচানোর সব চেষ্টা আমরা করবো। শুধু মাথা গরম করে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসো না।'

মিলার বললেন, 'তোমাদের বাড়ি সার্চ করার জন্যে ওয়ারেন্ট তৈরি করে ফেলেছে ডানকান।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন আকরামের দিকে। 'কিছু পাবে না তো?'

দীর্ঘ একমুহূর্ত উকিলের দিকে তাকিয়ে রইলো আকরাম। তারপর মুখ বাঁকিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই, আমি রেপোর্টের সবচে বড় ক্রিমিন্যাল। আমার বাড়িতে লাশ পড়ে আছে, সাপ লুকিয়ে রেখেছি বেসমেন্টে। আর কোনো দোষ চাপানোর আছে?' লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। 'আমার সাহায্য লাগবে না। আমি চুরি করিনি। বিশ্বাস না করলে কি আর করবো। একা থাকতে দিন আমাকে।'

'শোনো, আকরাম···,' কথা শেষ করতে পারলেন না মিস্টার মুরাদ। দমকা হাওয়ার মতো দরজার দিকে ছুটলো আকরাম। বেরিয়ে গেল।

'বাবা,' সুজা বললো, 'ওর ব্যবহারে কিছু মনে করো না। ওর এখন মাথার ঠিক নেই।'

মিলার উঠে দাঁড়ালেন। 'আমিও যাই।' মাথা নাড়লেন নিরাশ ভঙ্গিতে। 'ছেলেটার জন্যে ভয় হচ্ছে আমার, বিপদ বাড়াবে।'

'বাবা, কিছু করতে পারো না?' অনুরোধ করলো রেজা।

'করতে তো চাই,' ভীষণ চিন্তিত লাগছে মিস্টার মুরাদকে। 'কিন্তু জরুরী একটা কেস রয়েছে এখন আমার হাতে। একদম সময় করতে পারছি না।' আনমনে টেবিলে টাট্টু বাজালেন তিনি। 'ছেলেটার কপালই খারাপ। মোটিভ আছে। রিচারের সঙ্গে শত্রুতা, কিছুক্ষণের জন্যে নিখোঁজ হয়ে থাকা, সবই তার বিপক্ষে যাবে।' দুই ছেলের দিকে তাকালেন। 'তবে, সাপগুলো নেই তার কাছে। এক কাজ করো, সাপগুলো খুঁজে বের করো। আর জানার চেষ্টা করো, সাপ ছুটে যাওয়ায় কার লাভ হয়েছে।' হাসলেন মিস্টার মুরাদ। 'গোয়েন্দা হওয়ার শখ তো। এইই সুযোগ।'

ছেলেরাও হাসলো।

'তবে,' বললেন তিনি, 'কাজটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। জটিল রহস্য আর ভয়ানক বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি। হুঁশিয়ার থেকো।'

পরদিন সকালে, হাতের খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর আছড়ে ফেললো সুজা। 'সামনের পৃষ্ঠায় খবর হয়ে গেছে আকরাম খান। দেখো, কি সব রোমাঞ্চকর হেডিং দিয়েছে।'

নাস্তা খেতে খেতে মুখ তুললো রেজা। 'ওসব ছাইপাঁশ দেখার দরকার নেই। এখন কাজ করতে হবে আমাদের। মুশকিল হলো, কোনো সূত্র নেই হাতে। যা আছে, সবই আকরামের বিপক্ষে। ওর আচরণও মস্ত ক্ষতি করবে।'

'বুঝতে পারছি,' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলো সুজা। 'কি মনে

হয় তোমার ?' আসলেই কি আকরাম দোষী ?'

ভাইয়ের দিকে নীরবে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো রেজা। মাথা ঝাঁকালো। 'আমার মনেও এসেছে প্রশ্নটা। জানি তো, কম্পিউটার কেনার জন্যে কি রকম পাগল হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু ও বলছে চুরি করেনি, কথাটা বিশ্বাস করতে হচ্ছে আমাদের। ও না করলে অন্য কেউ করেছে। সেটাই খুঁজে বের করতে হবে এখন।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললো সুজা। 'কোথায় গেল, তা-ও জানি না। কাল রাতে অনেক চেষ্টা করেছি, কেউ ফোন ধরলো না। ওদের বাড়িতে একবার গিয়ে দেখলে হয়।'

আধ ঘণ্টা পর আকরামদের বাড়িতে পৌঁছলো দুই ভাই। বাড়ির সামনে ভিড়, তিনটে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ভ্যান থেকে নেমে এগিয়ে গেল দু'জনে।

'হাই, সুজা,' ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক কিশোরী। সুজার চেয়ে বছর দু'য়েকের ছোট। সোনালি চুল। কাছে এসে বললো, 'খবরের কাগজে আকরামের দুরবস্থার কথা জানলাম। পড়েই ছুটে এসেছি আমি আর নিড।' মেয়েটার গভীর নীল চোখে শঙ্কার ছায়া। 'আকরামের কিছু হবে না তো ?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রেজা জিজ্ঞেস করলো, 'অ্যানি, নিড কই ?'

'ওই তো,' হাত তুলে দেখালো অ্যানিটা ব্রাউন।

বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে ছোটোখাটো এক হাতি। কাছে এসে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো।

ও নিড ব্রাউন, অ্যানিটার বড় ভাই। রেজা-সুজার মতোই ওরাও আকরামের বন্ধু।

'এই, রেজা, আকরামের কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো নিড। 'গেছে কোথায়?'

'বাড়ি নেই?' জিজ্ঞেস করলো রেজা।

'না। খবর পড়েই ছুটে এলাম। বাড়িতে গেলাম না। এই, তোমাদের বিশ্বাস হয়, ও এমন কাজ করেছে?'

'না,' একই সঙ্গে মাথা নাড়লো রেজা আর সুজা।

মাথা নেড়ে সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে বিরক্ত হয়ে বললো সুন্দরী অ্যানি, 'আর লোকেরও যা স্বভাব! একজনের জীবন যায়, আর ওদের আনন্দ দেখো। যত্তোসব!' দর্শকদের ভিড়ের দিকে চেয়ে নাক কুঁচকালো সে।

বাড়ির দিকে এগোলো চারজনে। লনের কাছে দেখা হলো পল নিউম্যানের সঙ্গে। তরুণ বয়েসী এই পুলিশ অফিসারকে চেনে ওরা, ঘনিষ্ঠতা আছে।

কিন্তু এখন হাসলো না পল। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এই যে, তোমরা। আকরামকে দেখেছো?'

'না,' জবাব দিলো রেজা। 'কেন? আবার কি হলো?'

ইঙ্গিতে দেখালো পল। একটা বড় বাক্স ধরাধরি করে আনছে দু'জন পুলিশ, খাঁচার মতো দেখতে। 'আকরামদের বাড়ির বেসমেন্টে পাওয়া গেছে।'

'কি আছে ওতে?' অ্যানি জিজ্ঞেস করলো।

ভাবলেশশূন্য চেহারা পলের। 'দুটো সাপ। এতোবড় গোখরো

জীবনে দেখিনি।'

'গোখরো!' আঁতকে উঠলো নিড। এখানে?' তাড়াতাড়ি আশেপাশে তাকালো সে, যেন দেখতে পাবে লনের মধ্যে আরও সাপ কিলবিল করছে।

'বেসমেন্টে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো,' আবার বললো পল।

'আমাদের চিড়িয়াখানার সাপ,' পেছন থেকে বলে উঠলো একটা কণ্ঠ।

ফিরে চাইলো ছেলেরা। জেমস কক, রাগে লাল মুখ। ভাঁজ করা একটা কাগজ পলকে দিতে দিতে বললেন, 'আটটা সাপের লিস্ট আছে। বর্ণনা আছে। গোখরোদুটোর সঙ্গে মেলে কিনা দেখুন। আমি শিওর, মিলে যাবে।' মুঠোবদ্ধ হলো আঙুল। 'কি চোরের চোর রে বাবা! আর কি ব্যবহার করেছে সাপগুলোর সঙ্গে। আসলে,' হাত নাড়লেন, 'মানুষ যে কি বোকা। সাপ দেখলেই চমকে যায়। ভাবে, কি সাংঘাতিক! অথচ ওগুলোর মতো নিরীহ জীবই হয় না।'

খাঁচাটা এনে রাখা হলো পলের সামনে।

ওটার ওপর ঝুঁকলেন কক। 'আর কি সুন্দর, দেখুন? কোথায় ভালোবাসবে, তা না। লোকে করে কি, চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যাগ বানায়, জুতো বানায়, ইতরের দল! আমি তো বলি, গোক্ষুরের চেয়ে ওরা খারাপ। মরুক গে! হ্যাঁ, চোরটার কথা বলি। ওই ব্যাটাকে নিয়ে গিয়ে জলদি জেলে ঢোকান। লোকটা ওই জুতো বানানেওয়ালাদের চেয়ে শয়তান।'

'শুনুন,' হাত তুললো রেজা। 'আপনি কি আকরামকেই চোর

মনে করছেন ?'

রেজার দিকে করে তর্জনীর খোঁচা মারলেন কক। 'আমি মনে করতে যাবো কেন ? সেটা যারা করার তারা করবে। আমি আমার সাপ পেলেই খুশি। তবে, আমি জানি রিচারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল তোমাদের বন্ধু খানের। রিচার এখন হাসপাতালে, আর চিড়িয়াখানার সাপ খানের বেসমেন্টে। কি প্রমাণ করে ?' কেউ জবাব দেয়ার আগেই ঘুরে গটমট করে চলে গেলেন তিনি।

'ফ্যানাটিকের মতো কথাবার্তা!' সর্প-সহকারীর কথা পছন্দ হয়নি সুজার।

তিক্ততা দূর করার জন্যে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল নিড, হাত নেড়ে দেখালো, 'দেখো কত লোক জমেছে!'

'দু'বার তাড়িয়েছি,' বিরক্ত হয়ে বললো পল। 'কতো তাড়াবো ? আসছে তো আসছেই। বেশ ভালো সাড়া ফেলে দিয়েছে আমাদের আকরাম সাহেব।'

'আমাকে ওদের বাড়িতে ঢুকতে দেবেন ?' অনুরোধ করলো রেজা।

মাথা নাড়লো পল। 'সরি, ভাই, পারছি না। পুলিশী তদন্ত চলছে এখন। এই সময়ে বাইরের কাউকে ঢুকতে দিতে পারি না, তোমারও জানা আছে।'

'আছে, কিন্তু...'

'সরি,' আবার বললো পল। 'তবে, একটা কাজ করতে পারি। কোনো তথ্য জানলে, তোমাকে সেটা জানাবো।'

নিজের কাজে চলে গেল পল নিউম্যান।

নিড বললো, 'বাড়ির বাইরে সূত্রটুত্র পাওয়া যাবে না?' গোয়েন্দাগিরিতে রেজা-সুজার মতো নিডও আগ্রহী। তিনজনে মিলে একটা গোয়েন্দা সংস্থা করার কথা ভাবছে অনেকদিন থেকেই। ওদের সঙ্গে অ্যানি থাকতে চাইলেও আপত্তি নেই।

উজ্জ্বল হলো সুজার মুখ। 'মন্দ বলোনি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সব সাজানো ব্যাপার, আকরামকে ফাঁদে ফেলার জন্যে। সাপগুলো এখানে আনা সম্ভবই ছিলো না তার পক্ষে। যে এনেছে, অসাবধানে কোনো চিহ্ন ফেলেও যেতে পারে।'

বাড়ির বাইরে যতোটা সম্ভব খুঁজে দেখলো চারজনে। চিহ্ন পাবে কোথায়? মাড়িয়ে সব একাকার করে দিয়েছে লোকে। 'নাহ্, পাওয়া যাবে না,' হাত ঝাড়লো অ্যানি।

'হুঁ,' ওদের ভ্যানের সামনে পার্ক করা গাড়িটায় হেলান দিলো সুজা। 'কিন্তু আকরামের ঘাড় থেকে দোষ সরাতেই হবে।' ভাইয়ের দিকে তাকালো। 'দাদা, রিচারের অফিসে আরেকবার দেখলে কেমন হয়?'

'কেন?'

'ভেন্টিলেটরের এয়ার শ্যাফটে কেউ ঢুকে দেখেনি। ওখানে কোনো সূত্র থাকতেও পারে।' হাসলো সুজা। 'বাবা আমাদের প্রথম পাঠ কি দিয়েছিলো?'

রেজাও হাসলো। 'প্রশ্ন করো। কাজ না হলে, আবার করো। তাতেও কাজ না হলে আবার করো।'

পকেট থেকে বাদামের প্যাকেট বের করলো নিড। হাতের

তালুতে ঢাললো ঝরঝর করে। করুণ চোখে তাকালো ওগুলোর দিকে। তারপর বেছে সব চেয়ে ছোট বাদামটা নিয়ে মুখে ফেলে বাকিগুলো আবার ভরে রাখলো প্যাকেটে। ওটা পকেটে রাখতে রাখতে বললো, 'কি যে কপাল নিয়ে এসেছি, সঙ্গে খাবার থাকতেও খাবার উপায় নেই। কিছুই খাই না, তা-ও হাতিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি দিন দিন।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। বাদামটা চিবিয়ে গিলে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে? ও, প্রশ্ন। অনেক প্রশ্ন জমা আছে আমার কাছে। কতোজন লোক জড়িত এই কেসে? ঢুকলো কোন পথে ওরা? ছাতের ওপর দিয়ে? ল্যাবের ভেতর দিয়ে? সাপগুলো কি করে বের করলো? কিছু সাপ ছাড়া কেন? নিজে নিজেই ছাড়া পেয়েছে, নাকি ছেড়ে দেয়া হয়েছে?' হাসলো। 'আরও বলবো?'

'না না, বাপু, আর দরকার নেই,' দু'হাত নাড়লো অ্যানি। রেজা-সুজাকে জানালো, 'কাল টিভিতে খবরটা শোনার পর থেকে আমাকে জ্বালাচ্ছে। খালি এসব প্রশ্ন করছে। আমি কি উত্তর দেবো, বলো? জানি?'

'কিন্তু,' গর্বের ভঙ্গিতে মাথা দোলালো নিড, 'স্বীকার করতেই হবে, এগুলো জরুরী প্রশ্ন।'

'করছি,' রেজা বললো। 'এ-ও স্বীকার করছি, কোনোটারই জবাব জানি না আমরা। সুজা ঠিকই বলেছে। ল্যাবরেটরিতে ভালোমতো তদন্ত হয়নি। ডক্টর রিচারের অফিসে আরেকবার খোঁজা দরকার।'

'তা তো বুঝলাম,' প্রশ্ন তুললো নিড। 'কিন্তু ঢুকবে কিভাবে?

জামাই আদর করে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ল্যাবরেটরিতে ঢোকাবে না ওরা।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। দিনের বেলা পারবো না। তবে···

'তবে কী?' অ্যানি বললো। 'রাতে? ধরতে পারলে কিলিয়ে ভর্তা বানাবে।'

'পারলে তো বানাবেই। তবে তোমাদের সে ভাবনা নেই···

'মানে?' বাধা দিয়ে বললো নিড। 'আমাদের নেই কেন?'

'তোমরা তো আর যাচ্ছো না।'

'কেন, যাবো না কেন?' তীব্র প্রতিবাদ করলো নিড। তার কথার পিঠে বললো অ্যানি, 'আমরা কি আকরামের বন্ধু নই? শুধু তোমরাই?'

'থাক, থাক, হয়েছে,' অ্যানি রেগে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি হাত তুললো সুজা। 'যাবে, তোমরাও যাবে। রাত আটটায় তৈরি থেকো। কে জানে, আকরামের সঙ্গেই হাজতবাস করতে হয় কিনা আমাদের!'

পাঁচ

বাকি দিনটা আকরামকে খুঁজে বেড়ালো চারজনে। কোথাও পেলো না। বিকেলে যার যার বাড়ি গিয়ে ডিনার খেয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে মিলিত হলো।

ঠিক আটটায়, চিড়িয়াখানায় ঢোকার মুখে, পথের মোড়ে গাছ পালার আড়ালে ভ্যান রাখলো রেজা। পা টিপে টিপে গেটের দিকে এগোলো চারজনে। রেজা আর সুজার পাসগুলো ফেরত নিতে ভুলে গিয়েছিলো প্রহরীরা, এখনও ওদের কাছেই রয়েছে। কোড বদলানো হয়নি। রেজার পাসটা স্লটে ঢোকাতেই খুলে গেল দরজা।

অন্ধকারে নিঃশব্দে গবেষণাগারের দিকে চললো ওরা।

প্রবেশ পথের সামনে এসে থামলো। ফিসফিসিয়ে বললো রেজা, 'এটাই।'

'লোকটোক নেই,' অ্যানির কথায়ই বোঝা গেল, ভয় পাচ্ছে।

'তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই,' সুজা বললো। 'সারা দিনই তো সাপ খুঁজেছে। রাতে যাদের ডিউটি, তারাও নিশ্চয়

ওই কাজেই ব্যস্ত। নিশ্চিন্তে সারতে পারবো আমরা।'

'বেশি আশা করো না,' বললো রেজা। 'কড়া সিকিউরিটি এখানে। ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না। ভেতরে ঢুকে গা ঘেঁষাঘেঁসি করে থাকবে সবাই। দুটো পাস, লোক চারজন। অন্য দু'জনকে ছাড়বে কিনা ইলেকট্রনিক আই, বোঝা যাচ্ছে না। একসাথে থাকলে হয়তো ফারাকটা ধরতে পারবে না। হয়তো মনে করবে, খুব মোটা দু'জন লোক আমরা।'

'দু'জন না, পাঁচজন ভাববে,' হেসে বললো সুজা।

'পাঁচজন?' বুঝতে পারলো না রেজা।

'হ্যাঁ। নিড একলাই তিনজন।'

অন্য সময়ে অন্য কোনোখানে হলে প্রাণ খুলে হাসা যেতো, এখন পারা গেল না। তবু, মুচকি হাসি চাপতে পারলো না রেজা। 'আর বেশিদিন মোটা থাকবে না। খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে তো।'

'হ্যাঁ,' করুণ কণ্ঠে অনুযোগ করলো নিড, 'দেখো না, কি বলে। খাওয়া কতো কমিয়ে দিয়েছি এখন। তখন এতো ভালো আইস-ক্রীমটা কিনেও খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার ফেরত দিয়ে এলাম। আর কি করবো? মোটা হয়েছি সে কি আমার দোষ?'

'আরে, নিড, সত্যি সত্যি রাগ করেছো দেখছি,' আন্তরিক দুঃখিত হলো সুজা। 'কিছু মনে করো না, ভাই, এমনি বল-লাম...'

'হয়েছে,' রেজা বাধা দিলো। 'ওসব কথা বাদ দিয়ে চলো এখন, যে কাজে এসেছি।'

এখানেও কোড পরিবর্তন করা হয়নি। রেজা কার্ড ঢোকাতেই

খুলে গেল ভারি দরজা। দু'জন দু'জন করে গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকলো ওরা। ঘণ্টা বাজলো না, সাইরেন বাজলো না। তারমানে হয় ফাঁকিতে পড়েছে যান্ত্রিক চোখ, নয়তো বন্ধ করে রাখা হয়েছে এখনও অ্যালার্ম সিসটেম।

নির্জন বারান্দা পেরিয়ে ডক্টর রিচারের অফিসে চলে এলো ওরা। ভাঙা দরজা মেরামত করা হয়নি। সুইচ খুঁজে বের করে টিপে দিলো সুজা। ফ্লোরেসেন্ট লাইটের উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে গেল ঘর।

'ব্যস, হয়েছে,' রেজা বললো, 'আর গা ঘেঁষে থাকার দরকার নেই।' সুজার কাছ থেকে সরে এলো সে। 'সিকিউরিটি চেক পয়েন্টগুলো ল্যাবের ভেতর, এখানে নয়।'

'হউফ! বাঁচলাম!' বলে বোনের কাছ থেকে সরলো নিড। 'এতো সাবধানে চলাফেরা করা যায় নাকি।'

'শুরু করা যাক এবার।' ভেন্টের দিকে হাত তুললো সুজা। 'স্ক্রু-ড্রাইভারটা যখন পাওয়া গেছে ওখানে, আরও কিছু যেতে পারে। পুলিশ বেশি ভেতরে ঢোকেনি।'

'নিড ওটার ভেতরে ঢুকতে পারবে না,' রেজা বললো। 'সুজা, তুই আর অ্যানি যা। আমরা ঘরটা খুঁজবো।'

নিড আর রেজার কাঁধে ভর রেখে এক এক করে উঠে এলো দু'জনে। শ্যাফটে ঢুকে পকেট থেকে টর্চ বের করলো সুজা। সরু ইস্পাতের সুড়ঙ্গ ধরে এগোলো। কেমন যেন অবাস্তব লাগছে জায়গাটা। মুখে লাগছে হালকা বাতাস, ওদের গা ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে পেছনে। বালিতে বুকে হেঁটে এগোনোর দাগ, নতুন।

পেছনে প্রায় গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে রয়েছে অ্যানি। ফিসফিস করে বললো, 'সুজা, আমার ভাল্লাগছে না। কেমন যেন ভূতুড়ে।' সামনে কালো এক গর্ত দেখালো। 'ওটা কি?'

'মনে হয়, মেইন ভেন্টিলেশন শ্যাফট। ছাত থেকে মেঝেতে নেমেছে।' নিচের দিকে চেয়ে কি বোঝার চেষ্টা করলো সুজা। 'নাকি আরও নিচে গেল?' চারকোণা গর্তটায় আলো ফেলে উঁকি দিয়ে তাকালো। আরও পাইপ দেখা গেল, তার নিচে নালা।

'ওগুলো কেন?' অ্যানি বললো। 'নিশ্চয় ঘর ঠাণ্ডা কিংবা গরম রাখার জন্যে। তলা দিয়ে আরও অনেক সুড়ঙ্গ গেছে, বোঝা যাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকালো সুজা। 'যাবো কোন দিকে? ওপরে, না নিচে? চোর কোনখান দিয়ে এসেছিলো?'

সুজার কাঁধে হাত রাখলো অ্যানি। ওপরের দিকে আঙুল তুলে দেখালো। 'ওই যে, দেখো, আকাশ।'

ধাতব সুড়ঙ্গে আরেকটা দাগ দেখে নিশ্চিত হয়ে গেল সুজা। 'ওপর দিয়েই এসেছিলো চোর।'

'কিভাবে? দেখছো কতোবড় ফ্যান?'

সুজার মনে পড়লো, কিভাবে রিচারের ডেস্কের কাগজ উড়ছিলো বাতাসে। তখন ওই ফ্যান ঘুরছিলো, বোঝা গেল। বললো, 'টর্চটা ধরো। আমি ওপরে উঠবো।'

'খুব সাবধান।'

মসৃণ ধাতব দেয়ালে পিঠ ঠেসে ধরে আরেক দেয়ালে পা ঠেকালো সুজা। এক পা তুলে দিলো ওপরে, পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে

রেখেই ঠেলে তুললো কয়েক ইঞ্চি, তারপর তুলে দিলো আরেক পা। আবার ঠেলে উঠলো কয়েক ইঞ্চি। এভাবেই উঠে গেল ফ্যানের ঠিক নিচে।

টর্চের আলোয় চকচক করছে ফ্যানের ইস্পাতের ব্লেড। ধীরে ধীরে ঘুরছে, বাইরে থেকে আসা বাতাসে। ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ব্লেড থামালো সুজা, ব্যথা লাগলো হাতে। বাতাসের চাপে ঘুরছিলো, তাতেই এতো জোর, আর বিদ্যুতে ঘুরলে কি প্রচণ্ড জোর হবে ভেবে অবাক হলো সে।

ধাতব দেয়ালে ওয়েল্ডিং করে ফ্যানের ফ্রেম লাগানো হয়েছে। ফ্রেমের একটা দণ্ড ধরে ব্লেডের ফাঁক দিয়ে টেনে তুললো শরীর। মাথার ওপর জালিকাটা ভারি ধাতব ঢাকনা। জাফরির ফাঁক দিয়ে তারা চোখে পড়ছে। ঠেলে ঢাকনা তোলার চেষ্টা করলো সে। নড়লো না ওটা।

'অ্যানি,' ডেকে বললো সুজা, 'টর্চটা উঁচু করে ধরো।'

'হবে?'

'হ্যাঁ, হবে। দেখা যায়। ঢাকনার কিনারে আঁচড়ের দাগ, খোঁচা লেগে রঙ উঠে গেছে। নিশ্চয় কেউ ঢুকেছিলো এখান দিয়ে।'

'ঢাকনা সরানো যায়?'

আরেকটু উঠলো সুজা। হুড়কো দেখতে পেলো। 'পারতাম, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার হলে। আঙুল দিয়ে বল্টু ঘোরাতে পারছি না।'

'দাঁড়াও, নিয়ে আসি।'

'রাখো, রাখো, যেতে হবে না। পকেটে ছুরি আছে। ওটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখি।'

বেশ কায়দা কসরৎ করে পকেট থেকে ছুরিটা বের করলো সুজা। এক দেয়ালে পিঠ, আরেক দেয়ালে পা। গায়ের জোরে আটকে রয়েছে মসৃণ চারকোণা পাইপটার মধ্যে। তবু, বেকায়দা অবস্থায় থাকতে থাকতে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করেছে পেশি। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ফলাটা বের করতে বেশ অসুবিধে হলো।

হুড়কো খোলার চেষ্টা চালালো সুজা। কয়েক সেকেণ্ডেই বুঝে গেল, কেন আকরামের ভারি স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহার করতে হয়েছে চোরকে। ওই হুড়কোর তুলনায় তার ছোট যন্ত্রটা নিতান্তই খেলনা। বেশি চাপাচাপি করতে গেলে ছুরির ফলাই ভাঙবে শুধু, লাভ হবে না। চেপে রাখা বাতাস ফুসফুস থেকে বের করে দিয়ে বললো, 'হচ্ছে না। স্ক্রু-ড্রাইভারই লাগবে।'

'নো প্রোবলেম,' নিচ থেকে বললো অ্যানি। 'নিয়ে আসছি। যাবো আর...'

তার বাক্যের শেষ অংশ হারিয়ে গেল জোরালো গুঞ্জনে। ভারি বৈদ্যুতিক মোটর চালু হয়েছে।

'সুজা!' চেঁচিয়ে বললো অ্যানি। 'জলদি নেমে এসো!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। আতংকিত হয়ে দেখলো সুজা, ঘুরতে শুরু করেছে বিশাল ফ্যানের দানবীয় পাখাগুলো। গতি বাড়ছে দ্রুত। কী ভয়ানক বিপদে পড়েছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। ওটার মধ্যে পড়লে চোখের পলকে তাকে কিমা বানিয়ে

ফেলবে ব্লেডগুলো।

'অ্যানি!' মোটরের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠলো সুজা। 'জলদি গিয়ে দাদাকে বলো। জলদি করো, আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না!'

জবাব শোনা গেল না। মোটর আর বাতাসের শব্দ ভীষণ হয়ে উঠেছে।

অতি-সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে আরও ওপরে উঠে গেল সুজা, ঢাকনাটা এখন তার চাঁদি ছুঁয়েছে। ব্যথা শুরু হয়ে গেছে পায়ের পেশিতে, খিঁচ ধরে যাবে যে-কোনো মুহূর্তে। বেরোনোর একটাই পথ। ওপর দিয়ে, ওই ঢাকনা তুলে। খুদে ছুরির ফলা দিয়েই হুড়কো খোলার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করলো সে।

পায়ের পেশিতে দহন শুরু হয়েছে, মাংসের ভেতরে জ্বলন্ত কয়লা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। পিঠে অসহ্য ব্যথা। ঘামে ভেজা হাতের তালুতে থাকতে চাইছে না ছুরির হাতল, পিছলে যায়। মোচড় দিলো আবার। সামান্য নড়লো হুড়কোর স্ক্রু। চাপ বাড়লো। শব্দ শুনলো না, কিন্তু টের পেলো ভেঙে গেছে ছুরির ফলা। ব্লেডের ওপর পড়লো ওটা, বাড়ি খেয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল নিচে।

মুক্তির পথ নেই!

'অ্যানি!' ককিয়ে উঠলো সুজা।

জালির ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে শরীরের ভর রাখতে চাইলো, তাতে খানিকটা বিশ্রাম পাবে খিঁচধরা মাংসপেশি। কিন্তু ফুটোগুলো এতো সরু, আঙুল ঢুকলো না।

আর আটকে থাকতে পারলো না সে। পিছলে পড়তে শুরু করলো। কানের পর্দায় যেন আঘাত হানছে ফ্যানের শব্দ, বাইরে থেকে বাতাস টানছে ওটা, টান অনুভব করছে সুজা। অমানুষিক চেষ্টায় পায়ের চাপ একটু বাড়ালো বটে, কিন্তু বাড়িয়ে রাখতে পারলো না। কথা শুনছে না পেশি। আবছা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালো সে। টের পাচ্ছে ধীরে ধীরে নেমে চলেছে ফ্যানের কাছে।

দুর্বল হয়ে আসা পায়ে ভয়াবহ যন্ত্রণা। পেশিতে খিঁচ ধরলে যে এমন ব্যথা হয়, কল্পনাও করেনি কোনোদিন সে। আর বড়-জোর কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই পড়বে গিয়ে ওই মারাত্মক ইস্পা-তের পাতের মধ্যে। শার্টের ঝুল পতপত করছে বাতাসে, ব্লেডের সঙ্গে লাগলো বলে।

মরিয়া হয়ে উঠলো সুজা। উঠেও গেল কয়েক ইঞ্চি। কিন্তু এ-জন্যে আরও বেশি মূল্য দিতে হলো পেশিকে। এতোক্ষণ স্থির ছিলো পা, এখন কাঁপতে শুরু করলো। অবাধ্য হয়ে উঠলো পুরোপুরি। শরীর ঠেকিয়ে রাখারও আর সাধ্য হলো না। দ্রুত পিছলে পড়তে লাগলো।

আর মাত্র ক'সেকেণ্ড। তারপরেই···।

ছয়

সম্ভাব্য প্রতিটি জায়গা খুঁজে দেখছে রেজা আর নিড। খালি সাপের খাঁচা থেকে শুরু করে কম্পিউটার প্রিন্টারের মেসেজ, কিছুই বাদ দিচ্ছে না।

'নাহ্, কিছুই নেই,' নিরাশ হয়ে বললো নিড। 'অ্যানি আর সুজা কি করছে কে জানে।'

হঠাৎ ঝিরঝির আওয়াজ কানে এলো ওদের, গায়ে লাগলো ঠাণ্ডা বাতাস।

হাসলো নিড। 'ভালো হলো। যা গরম লাগছিলো এখানে।'

ঠং করে বিচিত্র শব্দ হলো। ভেসে এলো ভেন্ট দিয়ে।

চমকে উঠলো রেজা। 'বিপদে পড়লো না তো!' উদ্বিগ্ন চোখে ভেন্টের দিকে তাকালো সে।

বড় বড় হয়ে গেল নিডের চোখ। 'সর্বনাশ! ফ্যান চালু হওয়ার পর শব্দটা এসেছে! তারমানে ব্লেডে বাড়ি খেয়েছে কিছু।' খপ করে রেজার হাত চেপে ধরলো সে। 'জলদি করো! ওদের বের করো!'

চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়েই থেমে গেল রেজা। প্রহরীরা শুনে ফেলবে। কিন্তু আর কি করার আছে?

অ্যানির ফ্যাকাশে মুখ উঁকি দিলো ভেন্টের মুখে। ককিয়ে উঠলো, 'সুজা মারা যাচ্ছে! জলদি ওকে বাঁচাও! ফ্যান···ফ্যান বন্ধ করো!'

বোনকে নামতে সাহায্য করলো নিড।

ভেন্টের দুই ধার খামচে ধরে নিজেকে টেনে তুললো রেজা। মুখ বের করে নিডকে বললো, 'ফ্যানের সুইচটা খুঁজে বের করো। আমি যাই।'

'রেজাভাই,' অ্যানি ডাকলো, 'এটা নিয়ে যাও।' টর্চটা বাড়িয়ে দিলো সে।

শ্যাফটে ঢুকে গেল রেজা। নিড আর অ্যানি পাগলের মতো খুঁজতে শুরু করলো ফ্যানের সুইচ। পেলো না। নিড বললো, 'নিশ্চয় অফিসের বাইরে আছে। চলো চলো, দেখি।'

'না, ভাই!' সাবধান করলো অ্যানি। 'তোমার পাস নেই। অ্যালার্ম বেজে উঠবে।'

বোনের কথায় কান দিলো না নিড। সে দরজার বাইরে পা রাখতে না রাখতেই বেজে উঠলো ঘণ্টা। কানফাটা শব্দে ঢাকা পড়ে গেল ফ্যানের ঝিরঝির।

'পেয়েছি!' বলে উঠলো অ্যানি। একটা বুককেসের পাশে। ডায়াল ঘুরিয়ে 'জিরো'তে নিয়ে এলো সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ফ্যানের মোটরের গুঞ্জন, কমে গেল ভেন্টের মুখ দিয়ে বেরোনো বাতাস।

ঘণ্টাও বন্ধ হলো ওদিকে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে নিশ্চয়। ছুটে আসছে পদশব্দ।

'এবার একটা যুতসই গপ্পো শোনাতে হবে আমাদের,' বিড়-বিড় করলো নিড।

দরজায় দেখা দিলো গার্ডের পোশাক পরা এক লোক। 'কে তোমরা?' মোটা গলায় প্রশ্ন। 'এখানে কি?'

শ্রাগ করলো নিড। হাসলো বোকার মতো। 'চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছিলাম, অফিসার।'

শ্যাফট ধরে দ্রুত এগোচ্ছে রেজা। নিডের গলা কানে আসছে, কথা অস্পষ্ট। মুখে বাতাসের ঝাপটা কমে গেছে হঠাৎ করে, নিশ্চয় সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে নিড। কিন্তু দেরি হয়ে যায়নি তো? আরও দ্রুত এগোলো সে। পৌঁছে গেল মেইন শ্যাফটের মুখের কাছে।

'সুজা?' ডাকলো সে। 'এই, সুজা, কোথায় তুই?'

নিচ থেকে উঠে এলো মৃদু গোঙানি। পেনলাইটের স্বল্প আলোয় দেখা গেল, শ্যাফটের তলায় পড়ে আছে সুজা।

'এই, সুজা, ঠিক আছিস তুই?' জিজ্ঞেস করলো উদ্বিগ্ন রেজা।

জবাবে আবার গোঙানি।

নিচে নামলো রেজা। ভাইয়ের ওপর আলো ফেলে ডাকলো, 'সুজা।'

এবার আর গোঙানিও নেই। কপালে কাটা দাগ। ভাইয়ের কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকি দিলো রেজা। 'এই, সুজা? সুজা? কথা

বলছিস না কেন ?'

'ওফ, ব্যথা পাচ্ছি তো। ছাড়ো,' গোঁ গোঁ করলো সুজা।

এতোক্ষণে হাসি ফুটলো রেজার মুখে। 'কপাল কেটেছে। আর কোথাও ব্যথা পেয়েছিস ?'

আরেকবার গুঙিয়ে উঠে বসলো সুজা। 'পেয়েছিস মানে ? রীতিমতো বল খেলা হয়েছে আমাকে নিয়ে। ওফ, বাবাগো, চোর কিলান কিলিয়েছে।'

'কি হয়েছিলো ?'

'কি আর হবে ? আরেকটু হলেই কিমা হয়ে গিয়েছিলাম। ফ্যানটা হঠাৎ চালু হয়ে গেল, আমিও পিছলে পড়তে শুরু করলাম। যখন হাল ছেড়ে দিলাম, তখনই বন্ধ হয়ে গেল ফ্যান। আর এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক হলেই গেছিলাম। তারপর আর ধরে রাখতে পারলাম না নিজেকে। ফাঁক দিয়ে কিভাবে যে পড়লাম…।'

'অ্যানি খবর দিয়েছে আমাদের। ওর কাছে ঋণী হয়ে গেলি।'

হাসলো সুজা। 'ঋণী থাকতে আপত্তি নেই আমার।'

ওপর দিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিলো রেজার। বাতাসে অল্প অল্প ঘুরছে ফ্যানের ব্লেড। 'সুজা, বড় বাঁচা বেঁচেছিস।'

'আমি ভাবছি, চোরেরা ফ্যানটার কথা জানে কিনা ?'

'নিশ্চয় জানে।'

মাথা ঝাঁকালো সুজা। দাঁড়াতে গিয়ে ককিয়ে উঠলো। 'বাবারে, ভর্তা হয়ে গেছে সব।' দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো না আর, দেয়ালে হেলান দিলো। 'সুইচটা নিশ্চয় রিচারের অফিসে। তারমানে,

চোর ঢোকার আগে ফ্যান বন্ধ করে দিয়েছিলো কেউ। এমন কেউ, যার অধিকার আছে ওই অফিসে ঢোকার।'

'তারপর আবার চালু করে দিয়েছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো রেজা, 'চোর বেরিয়ে যাওয়ার পর। আমরা ঘরে ঢুকে ফ্যানটা চালু পেয়েছি। চোরের সঙ্গে রিচার হাত মেলাননি তো?'

টর্চ নেভানো। অন্ধকারেও যেন সুজার চোখে বিস্ময় দেখতে পেলো রেজা। 'কি বলছো?' বিস্মিত কণ্ঠ। 'রিচার নিজের সাপ নিজে চুরি করবেন কেন?'

'সাপ কেন চুরি হলো; সেটাই বুঝতে পারছি না আমি। আরেকটা ব্যাপার হতে পারে,' থামলো এক মুহূর্ত রেজা। 'হয়তো সুইচ অফ করে চোরকে সাহায্য করা হয়নি। চোর জানে কখন ফ্যান চালু হয়, কখন বন্ধ থাকে। বিরতি দিয়ে দিয়ে হয়তো চালু হয় ভেন্টিলেশন সিসটেম। ওই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে সে।'

'এটা হতে পারে। ডক্টর রিচারকে চোরের সাগরেদ ভাবতে পারছি না আমি। তাহলে তিনি আহত হতেন না।'

'ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে।'

'তা পারে। কিন্তু বিশ্বাস করা কঠিন।'

'তা ঠিক। তবু, আকরামকে চোর ভাবার চেয়ে রিচারকে চোর ভাবতে রাজি আছি আমি।'

বাইরে চাঁদ উঠেছে। শ্যাফটের মুখ দিয়ে আবছা আলো আসতে শুরু করেছে।

'বেরোনো দরকার এখান থেকে,' রেজা বললো। 'ওদিকে ওরা কি করছে কে জানে। সুইচ খুঁজতে গিয়ে অ্যালার্ম চালু

করে দিয়েছে। ঘণ্টার শব্দ শুনেছি আমি।'

'এখুনি বেরোবো? আর সুযোগ্ না-ও পেতে পারি। ছাতটা একবার দেখে গেলে হয় না?' কপালের কাটায় হাত বোলালো সুজা। 'কি আছে দেখা দরকার।'

'উঠতে পারবি?'

'পারবো।'

'চল তাহলে। তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'কিন্তু ঢাকনা খোলার জন্যে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার দরকার।'

তলায় নানারকম বাতিল জিনিস পড়ে আছে। পেনলাইটের আলোয় শক্ত একটা ইস্পাতের পাত দেখতে পেলো রেজা, স্ক্রু-ড্রাইভারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। জিজ্ঞেস করলো, 'এটা দিয়ে হবে?'

'হতে পারে।'

শ্যাফট বেয়ে আগে আগে উঠতে শুরু করলো রেজা। খানিক আগে যেভাবে সুজা উঠেছিলো, সেভাবে। সুজাও তার পিছু নিলো। ব্লেডের ফাঁক দিয়ে যাওয়ার সময় শিউরে উঠলো সে।

স্ক্রু-ড্রাইভারের মতো সহজে হলো না বটে, তবে পাতটা দিয়ে হুড়কোর স্ক্রু ঘোরানো গেল। ঢাকনা খুলে ফেললো রেজা। বেরিয়ে এলো খোলা ছাতে।

অক্টোবরের ঠাণ্ডা বাতাস পরশ বোলালো ওদের ঘামে ভেজা তেতে ওঠা শরীরে। ছাতে দাঁড়িয়ে চোখ বোলালো চারপাশে। বাড়িটাকে অর্ধচন্দ্রের আকারে ঘিরে রেখেছে ছায়াঢাকা বন। কানে আসছে চিড়িয়াখানার নিশাচর জীবের বিচিত্র ডাক।

কোনো কোনোটা ভীতিকর। কেমন অপার্থিব পরিবেশ, এই পৃথিবীতে নয়, যেন অন্য কোনো গ্রহে পৌঁছে গেছে ওরা।

গাছগুলো দেখিয়ে বললো রেজা, 'নিচে থাকলে ওই গাছের জন্যে ছাত দেখা যাবে না।'

মাথা নেড়ে সায় জানালো সুজা। ছাতের কিনার ধরে হাঁটতে শুরু করলো। মিহি বালিতে ঢেকে রয়েছে সারা ছাত। পেনলাইটের আলোয় পায়ের ছাপ চোখে পড়লো। ঝুঁকে বসে ভালোমতো দেখলো সে। 'দু'জন মনে হচ্ছে। বেশিও হতে পারে।'

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলছে রেজা।

কি ভেবে আবার শ্যাফটের মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো সুজা। হাত নেড়ে ডাকলো ভাইকে। 'আলো ফেলো তো এখানে?... এই যে, দেখ, দাগ।' রঙ নেই এক জায়গায়, উঠে গেছে ঘষা লেগে। সেটায় আঙুল বোলাতে বোলাতে বললো, 'দড়ির ঘষা। ভারি কিছু দড়িতে বেঁধে টেনে তোলা হয়েছে।'

একমত হলো রেজাও। 'এখন বুঝতে পারছি, কি করে বের করেছে। কিন্তু নিলো কে? সাপ দিয়ে কি করবে সে?'

'হয়তো কোনো খেপাটে সংগ্রহকারী।'

'হয়তো। তবে তাকে খেপাটে বলা যায় না, বলতে হয় বদ্ধ উন্মাদ। বাঁচতে পারবে না। লুকিয়ে রাখা কঠিন হবে। সাপপাগল লোক কে কে আছে এই শহরে, সহজেই খুঁজে বের করে ফেলবে পুলিশ। ...আয়, পুরো ছাতটা ঘুরে দেখি আর কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

আলো ফেলে খুব ধীরে ধীরে এগোলো ওরা। সতর্ক দৃষ্টি, যাতে কোনো কিছুই চোখ না এড়ায়। হঠাৎ থেমে গেল রেজা। ছাতের কিনারে ফেলে রাখা কয়েকটা বাক্স দেখিয়ে বললো, 'দেখে-ছিস!'

'আরি! ওই বাক্সটার মতোই তো! টাইগার স্নেকটা যেটায় করে এনেছে।'

কাত হয়ে আছে একটা বাক্স, ঢাকনা খোলা। ভেতরে আলো ফেললো রেজা। খালি বাক্স। কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে সুজার নজরে পড়লো ব্যাপারটা। আঁকাবাঁকা একটা ছায়া। ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ শিরশির করে নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। চাপা গলায় বললো, 'দাদা, দেখো!'

আলো ঘোরালো রেজা। বালিতে আরেকটা দাগ স্পষ্ট, এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গেছে। পায়ের ছাপ নয়, বড় কোনো সাপের বুকে হেঁটে এগিয়ে যাওয়ার মতো দাগ। ইস্, আরেকটা বড় টর্চ যদি হাতে থাকতো! পেনলাইটের ম্লান আলো। ব্যাটারি কমে যাও-য়ায় আরও কমে এসেছে। দাগটা অনুসরণ করে গেলে আচমকা মারাত্মক জীবটার মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার আশংকা।

যাবে?

দু'জনেই একমত হলো, দেখা উচিত। খুব সাবধানে দাগ ধরে ধরে এগোলো ওরা।

দাগটা শেষ হয়েছে ছাতের কিনারে। বৃষ্টির পানি নেমে যাও-য়ার জন্যে ড্রেনপাইপ আছে, ওটার মুখের কাছে।

সাপটাকে না দেখে খুশিই হলো রেজা। 'বোঝা গেল, ডরি

কোনদিক দিয়ে পালিয়েছে।' দূরে তাকালো সে। গাছপালার ভেতরে একঝাঁক আলো দেখা গেল। 'ওটাই ধোবাখানা। ওখানেই গোখরোটাকে পাওয়া গেছে। বাচ্চাটা খেলছিলো।'

'হ্যাঁ। পাইপ দিয়ে মাটিতে নেমে বনের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিলো।'

পেনলাইটের ম্লান আলোয় আরও কতগুলো দাগ দেখতে পেলো দু'জনে।

'দেখ, চ্যাপ্টা কিছু একটা পড়েছিলো এখানে,' রেজা বললো। 'আর এই যে, এখানে দেখ। বাক্সের কোণা ঘষে গেছে মনে হয়। ...তাড়াহুড়োয় হাত থেকে বাক্স ফেলে দিয়েছিলো হয়তো চোরটা।'

'হুঁ। ডরির খাঁচা। কোনোভাবে পড়ে খুলে গিয়েছিলো, তারপর আর সাপটাকে ধরতে পারেনি চোর। পালিয়েছিলো ওটা।'

ওখান থেকে কয়েক ফুট দূরে একটুকরো দড়ি পাওয়া গেল। ওদের অনুমান, ওটা দিয়ে বেঁধেই খাঁচাগুলো টেনে তুলেছে চোর। তারপর ওটায় ঝুলিয়েই আবার মাটিতে নামিয়েছে। দড়ির কাছে পড়ে আছে আরেকটা বাক্স। ডালা বন্ধ। অক্ষত।

'এটা ফেলে গেল কেন?' আনমনে বললো সুজা। এগিয়ে গিয়ে ওল্টানোর জন্যে হাত বাড়ালো, লেবেলে কি লেখা আছে, পড়তে। বাক্সের ধার সবে ছুঁয়েছে তার আঙুল, থাবা মেরে হাত সরিয়ে দিলো রেজা।

বাক্সের ভেতরে রাগে হিসিয়ে উঠলো প্রাণীটা।

খাঁচাটা খালি নয়।

সাত

লাফিয়ে সরে এলো সুজা, যেন তাজা বোমায় হাত দিতে যাচ্ছিলো।

সরাসরি বাক্সের ওপর আলো ফেললো রেজা। প্লাস্টিকের মিহি তার দিয়ে ঢাকনা তৈরি হয়েছে। ভেতরে কি আছে স্পষ্ট চোখে পড়ে না। কালচে-বাদামী একটা সরীসৃপের নড়াচড়া বোঝা গেল। লেবেলে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে : ক্রেইট।

'ক্রেইট!' উত্তেজিত কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলো রেজা। 'গোখরোর একটা প্রজাতি। এটা এখানে ফেলে গেল কেন?'

কেঁপে উঠলো সুজা। 'আরে দেখো ভালো করে! হুড়কো খোলা! চোরটাই খুলে রেখে গেছে কিনা কে জানে! নাকি তাড়াহুড়োয় ফেলে পালিয়েছে, বন্ধ করার আর সুযোগ হয়নি? আল্লাহই জানে, এটার বিষদাঁত আছে, না ডরির মতো ভাঙা!'

নড়ে উঠলো আবার সাপটা। ফাঁক হলো বাক্সের ডালা। বেরিয়ে এলো আঁশযুক্ত একটা নাক।

হুড়কো লাগাতে গেল সুজা। চোখের পলকে মুখ বের করে

ফেললো সাপটা, ছোবল মারলো। ঝট করে হাত সরিয়ে আনলো সে, লাফিয়ে সোজা হতে গিয়ে ধাক্কা লাগালো রেজার হাতে, উড়ে চলে গেল পেনলাইটটা।

ম্লান আলো যা-ও বা ছিলো, গেল চলে। মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। খোলা ছাতে কুৎসিত ভয়ংকর এক সরীসৃপের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হবে এখন। সবচেয়ে বড় ভয়, খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়েছে বিপজ্জনক প্রাণীটা।

'কিছু করা দরকার!' জরুরী কণ্ঠে বললো সুজা।

জবাব দিলো না রেজা।

'এই, দাদা, কথা বলছো না কেন?'

'কি বলবো? ওটার ইচ্ছের ওপরই এখন সব কিছু নির্ভর করছে। ঠাণ্ডা সইতে না পেরে আবার হয়তো বাক্সে ঢুকবে।'

'যদি না ঢোকে? যদি বাক্সের চেয়ে গরম কিছুর খোঁজে আসে? মানুষের শরীরের তাপ?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। সময় যেন স্থির। অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করছে, কান খাড়া রেখেছে সামান্যতম শব্দের জন্যে। কিন্তু নিঃশব্দে চলাচল করে সাপ।

মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ। দেখা যাচ্ছে বাক্সটা। সাপটা নেই, মানে, বাক্সের বাইরে দেখা গেল না। ভেতরে কি আছে? সাবধানে ঝুঁকে হুড়কোটা লাগিয়ে দিলো রেজা। তারপর থাবা দিলো ডালার ওপর।

ভেতরে রেগে উঠলো সাপটা। যে কারণেই হোক, বেরিয়েও গেয়োয়নি, আবার ঢুকে গেছে বাক্সে। বোধহয় বাইরে শীত

বলেই।

হুড়কো লাগিয়েও নিরাপদ মনে করলো না রেজা। দড়িটা তুলে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেললো বাক্সের ডালা, হুড়কো খুলে গেলেও ডালা তুলতে পারবে না আর সাপটা। 'যাক, এইবার নিশ্চিন্ত।' হাসলো। 'এটা ফিরিয়ে দেয়ার সময় কি গল্প শোনাবো চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে?'

'যা খুশি বলে দিলেই হলো, কিছু যায়-আসে না আর। নিড আর অ্যানিকে নিশ্চয় ধরে ফেলেছে এতোক্ষণে।

পাইপ বেয়ে নামলো দু'জনে। দরজা দিয়ে ঢুকলো ল্যাবরেটরিতে। পাগল হয়ে উঠলো পাগলা ঘন্টিগুলো। তৈরিই ছিলো প্রহরীরা। দুই ভাইকে নিয়ে এসে রিচারের অফিসে ঢোকালো। ডেস্কের ধারে চেয়ারে মুখ কালো করে বসে আছে নিড আর অ্যানি। দুই ভাইকে দেখে উজ্জ্বল হলো মুখ।

আরেকটা পরিচিত মুখ রয়েছে ঘরে।

'যাক, ভালোই আছো,' বললো পল নিউম্যান। 'দয়া করে বলে ফেলো তো এখন ঘটনাটা কি? পুরো শ্যাফটে খুঁজলাম তোমাদের। গিয়েছিলে কই?'

একটা বাক্স নিয়ে ঢুকলো একজন প্রহরী। দেখে চমকে উঠলো পল। 'এটা পেলে কোথায়?'

'ওদের কাছে,' দুই ভাইকে দেখিয়ে দিলো গার্ড।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালো পল।

'কি ভাবছেন?' রেজা বললো। 'চুরি করছিলাম?'

'দেখো,' গম্ভীর হলো পল, 'এমনিতেই বিনা অনুমতিতে ঢুকে

যথেষ্ট অন্যায় করেছো। তার ওপর চোরাই মালসহ হাতেনাতে ধরা পড়ার শাস্তি বুঝতে পারছো? চোরাই আটটার একটা নয়তো?'

'মনে হয়। আমরা চুরি করিনি। আকরামকে সাহায্য করতে চাইছি।' কিভাবে কি ঘটেছে সংক্ষেপে জানালো রেজা।

'হুঁ!' মাথা দোলালো পল। 'তাহলে এই ব্যাপার। ছাত দিয়ে নেমেছে। বেরিয়েছেও ওই পথেই।'

'তাই তো মনে হলো। চোর একলা নয়, তার সহকারী আছে।'

'কেন, একজনে পারে না?' নিড বললো।

'কি জানি। বোধহয় না।'

'সহকারীটা কে?' মোলায়েম কণ্ঠে বললো পল। 'আকরাম?'

'আকরাম কিছুই করেনি!' রেগে গিয়ে বললো সুজা।

'কিন্তু সবকিছু তো ওকেই নির্দেশ করছে।'

'কি নির্দেশ করছে? একটা স্ক্রু-ড্রাইভার? যে কেউ ফেলে রাখতে পারে ওটা শ্যাফটে। আর বাড়ির বেসমেন্টে সাপ? ফাঁসানোর ইচ্ছে হলে ওগুলোও লুকিয়ে রেখে আসা যায়।' সুজার চোখ জ্বলছে। 'বেচারাকে ফাঁসানো হয়েছে।'

নীরবে সুজার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো পল। তারপর বললো, 'আকরামের টাকার প্রয়োজন ছিলো।'

'ছিলো। নতুন মডেলের একটা কম্পিউটার ভীষণ পছন্দ তার। তাতেই বা কি? কেউ কোনো জিনিস কিনতে চাইলেই কি সে চোর প্রমাণিত হয়ে গেল নাকি?'

'না, তা প্রমাণিত হয় না,' হাত নাড়লো পল। 'ও চোর না হলে আমিও খুশি হতাম। কিন্তু ব্যাংকে ওর অ্যাকাউন্টে দশ হাজার ডলার জমা পড়েছে।'

মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সুজা। হাত তুললো। 'কখন জমা করলো সে? সকাল থেকে ছিলো আমাদের সঙ্গে, তারপর নিয়ে-গেলেন আপনারা। ব্যাংকে যাওয়ার সময়ই পায়নি।'

'টাকা জমা দেয়ার জন্যে আজকাল ব্যাংকে যাওয়ার দরকার পড়ে না।' ঘরের কোণে রাখা একটা কম্পিউটার দেখালো পল। 'ওটার সাহায্যে অর্ডার পাঠিয়েছে। সকালে ওই কাজ করে থাকতে পারে।'

জবাব দিতে পারলো না সুজা। রেজার দিকে তাকালো। সে-ও কিছু বলতে পারলো না। ঢোক গিললো সুজা, মাথা নাড়লো জোরে জোরে। 'যতো যা-ই বলুন, আমি বিশ্বাস করি না, আকরাম এ-কাজ করেছে। ঘাপলা একটা নিশ্চয় আছে কোথাও, যেটা বের করতে পারছেন না আপনারা।'

'তাছাড়া,' মুখ খুললো রেজা, 'কয়েকটা সাপের জন্যে দশ হাজার ডলার দিতে যাবে কে?'

'অনেকেই আছে,' শুকনো গলায় বললো পল। 'ডক্টর বিগলের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি। তিনি বললেন, বিষাক্ত সাপ দামি হওয়ার অনেক কারণ আছে।' নোটবুক বের করে পাতা ওল্টালো সে। 'লিখে এনেছি। রাজগোখরোর বিষ প্রতি আউন্সের দাম পনেরোশো ডলার। মালয়েশিয়ান গোখরোর বিষও একই দাম। ক্রেইটের বিষ,' মেঝেতে রাখা সাপের খাঁচাটার

দিকে তাকালো সে, 'বারোশো ডলার।' শব্দ করে নোটবুক বন্ধ করলো। 'টাইগার স্নেকের বিষ সবচেয়ে দামি; প্রতি আউন্স পঁচিশশো ডলার। এবং, তোমাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, একটা সাপ এক হপ্তায় এক আউন্স বিষ সহজেই সাপ্লাই দিতে পারে। তারমানে, বছরে ওই একটা সাপ থেকেই আয় করা যাবে পাঁচ লক্ষ ডলার। কি মনে হয়, দামি?'

চুপ করে রইলো সবাই।

'আরও আছে; আবার বললো পল। 'রেপটাইল ফার্ম আর ল্যাবরেটরিগুলোতে বিষাক্ত সাপ হীরার চেয়ে দামি।'

বিড়বিড় করলো রেজা, 'সাপের বিষ যে এতো দাম, জানতামই না।'

'করে কি বিষ দিয়ে?' সুজা জানতে চাইলো।

'বেশির ভাগ, গবেষণা। ডাক্তার বিগল বললেন মরফিনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় বিষ। তবে ব্যবহার হয় না সাধারণত, কারণ খুবই দামি। মিলানো সহজ নয়।' ক্রেইটের খাঁচার দিকে তাকালো পল। 'সাপের বিষ আহরণকে পেশা হিসেবে নিতে চায় না তেমন লোকে। কাজটা খুব বিপজ্জনক।'

'হ্যাঁ, ভুলচুক হলে ক্ষমা নেই,' মাথা ঝাঁকালো রেজা।

'কাজেই বুঝতেই পারছো, আকরামের সঙ্গে কথা বলা এখন খুবই জরুরী। সমস্ত প্রমাণ তার বিরুদ্ধে। লুকিয়ে থেকে বাঁচতে পারবে না।'

'দেখুন,' অ্যানি বললো, 'আকরামকে আমরা অনেকদিন থেকে চিনি। সে ওরকম কাজ করতে পারে না।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই বলি,' বোনের সঙ্গে সুর মেলালো নিড। 'এসবের অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। আকরাম কখনও কিছু চুরি করেছে বলে শুনিনি।'

'সব কিছুরই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে,' পল বললো। 'ও তোমাদের বন্ধু, তাই বিশ্বাস করতে পারছো না। জোরালো সব প্রমাণ, ফেলবে কি করে?'

'সিকিউরিটি বললো চোর ঢুকেছে,' পেছন থেকে বলে উঠলো একটা কণ্ঠ, 'তাই দেখতে এলাম।' ঘরে ঢুকলেন জেমস কক। নিড আর অ্যানিকে দেখলেন। 'ও, ধরা পড়েছে।' রেজা আর সুজার ওপর চোখ পড়তে বললেন, 'তোমরা এখানে কি করছো?' জবাবের অপেক্ষা করলেন না। পলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খানের খবর কি? পাওয়া গেছে?'

মাথা নাড়লো পল।

'বেশ, পাওয়া গেলে,' কঠিন হলো ককের কণ্ঠ, 'একটা খবর জানাবেন তাকে। হাজার হাজার ডলার দামের একটা রাজ-গোখরোর সর্বনাশ করে দিয়েছে সে। সকাল পর্যন্ত বাঁচে কিনা সন্দেহ।' স্বর নরম করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডক্টর রিচারের খবর কি?'

'ভালো না...,' থেমে গেল পল। খাঁচার মধ্যে হিসিয়ে উঠেছে ক্রেইট।

এতোক্ষণে বাক্সটার দিকে চোখ গেল ককের। ঝুলে পড়লো নিচের চোয়াল। প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ক্রেইট!'

'এটার জন্যে ওদের ধন্যবাদ জানাতে পারেন, মিস্টার কক,'

রেজা-সুজাকে দেখলো পল। 'ওরা খুঁজে পেয়েছে ছাতের ওপর।'

'ছাতের ওপর ? ওটা ওখানে গেল কিভাবে ?' বিস্ময় ফুটলো ককের চোখের তারায়। 'ওরাই বা ওখানে কি করতে গিয়েছিলো ?'

'ওদের বন্ধুকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। কিছু সূত্র পেয়েছে···,'

'ওসব সূত্র-ফুত্র নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার,' বাধা দিয়ে বললেন কক। 'নিয়মিত খাজনা দিই আমি, ওই খাজনা থেকে বেতন যায় আপনাদের পকেটে। আমি আশা করবো, চুরির তদন্ত করে সেটার কিনারা করবে পুলিশ, কয়েকটা বাচ্চা ছেলে নয়।' লম্বা দম টেনে ধীরে ধীরে ছাড়লেন তিনি। 'দেখুন, আমি খুব ক্লান্ত। কালও অনেক কাজ আছে। দয়া করে আপনারা যদি এখন যান··· সাপটাকে ঠিকঠাক করে রেখে আমিও যেতে পারি।'

পল নিউম্যানের মুখে রক্ত জমলো। 'বিনা অনুমতিতে চিড়িয়াখানায় ঢোকার জন্যে এদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে চান ?'

হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন কক। সাপের খাঁচাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছেলেদের দিকে ফিরলো পল। 'তোমরাও যেতে পারো। তবে ভবিষ্যতে এরকম কাজ আর করবে না। পরের বার আর সাপ না-ও পেতে পারো।'

বেরোনোর সময় পকেট থেকে কার্ডটা বের করে একজন গার্ডকে দিয়ে বললো রেজা, 'সকালে এটা ফেরত দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

সুজাও তার পাসটা বের করলো। থমকে গেল। অবাক হয়ে-

'হ্যাঁ, আমিও তাই বলি,' বোনের সঙ্গে সুর মেলালো নিড। 'এসবের অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। আকরাম কখনও কিছু চুরি করেছে বলে শুনিনি।'

'সব কিছুরই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে,' পল বললো। 'ও তোমাদের বন্ধু, তাই বিশ্বাস করতে পারছো না। জোরালো সব প্রমাণ, ফেলবে কি করে?'

'সিকিউরিটি বললো চোর ঢুকেছে,' পেছন থেকে বলে উঠলো একটা কণ্ঠ, 'তাই দেখতে এলাম।' ঘরে ঢুকলেন জেমস কক। নিড আর অ্যানিকে দেখলেন। 'ও, ধরা পড়েছে।' রেজা আর সুজার ওপর চোখ পড়তে বললেন, 'তোমরা এখানে কি করছো?' জবাবের অপেক্ষা করলেন না। পলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খানের খবর কি? পাওয়া গেছে?'

মাথা নাড়লো পল।

'বেশ, পাওয়া গেলে,' কঠিন হলো ককের কণ্ঠ, 'একটা খবর জানাবেন তাকে। হাজার হাজার ডলার দামের একটা রাজ-গোখরোর সর্বনাশ করে দিয়েছে সে। সকাল পর্যন্ত বাঁচে কিনা সন্দেহ।' স্বর নরম করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডক্টর রিচারের খবর কি?'

'ভালো না···,' থেমে গেল পল। খাঁচার মধ্যে হিসিয়ে উঠেছে ক্রেইট।

এতোক্ষণে বাক্সটার দিকে চোখ গেল ককের। ঝুলে পড়লো নিচের চোয়াল। প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ক্রেইট!'

'এটার জন্যে ওদের ধন্যবাদ জানাতে পারেন, মিস্টার কক,'

রেজা-সুজাকে দেখলো পল। 'ওরা খুঁজে পেয়েছে ছাতের ওপর।'

'ছাতের ওপর ? ওটা ওখানে গেল কিভাবে ?' বিস্ময় ফুটলো ককের চোখের তারায়। 'ওরাই বা ওখানে কি করতে গিয়েছিলো ?'

'ওদের বন্ধুকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। কিছু সূত্র পেয়েছে···,'

'ওসব সূত্র-ফুত্র নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার,' বাধা দিয়ে বললেন কক। 'নিয়মিত খাজনা দিই আমি, ওই খাজনা থেকে বেতন যায় আপনাদের পকেটে। আমি আশা করবো, চুরির তদন্ত করে সেটার কিনারা করবে পুলিশ, কয়েকটা বাচ্চা ছেলে নয়।' লম্বা দম টেনে ধীরে ধীরে ছাড়লেন তিনি। 'দেখুন, আমি খুব ক্লান্ত। কালও অনেক কাজ আছে। দয়া করে আপনারা যদি এখন যান··· সাপটাকে ঠিকঠাক করে রেখে আমিও যেতে পারি।'

পল নিউম্যানের মুখে রক্ত জমলো। 'বিনা অনুমতিতে চিড়িয়াখানায় ঢোকার জন্যে এদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে চান ?'

হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন কক। সাপের খাঁচাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছেলেদের দিকে ফিরলো পল। 'তোমরাও যেতে পারো। তবে ভবিষ্যতে এরকম কাজ আর করবে না। পরের বার আর সাপ না-ও পেতে পারো।'

বেরোনোর সময় পকেট থেকে কার্ডটা বের করে একজন গার্ডকে দিয়ে বললো রেজা, 'সকালে এটা ফেরত দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

সুজাও তার পাসটা বের করলো। থমকে গেল। অবাক হয়ে-

ছে। 'এই, দাঁড়াও দাঁড়াও,' ভাইকে বললো সে। 'ছাত থেকে নেমে আমরা ল্যাবরেটরিতে ঢোকার সময় অ্যালার্ম বেজেছিলো। কেন?'

হাসলো সিকিউরিটি ম্যান। 'তোমাদের পাস এখন বাতিল। কোড পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন পাস দেয়া হয়েছে স্টাফদের। সেরেছি এই ঘণ্টাখানেক আগে।' পাসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'এগুলো স্যুভনির হিসেবে রেখে দিতে পারো।'

পাস দুটো আবার পকেটে ভরে রাখলো দুই ভাই। পলের পিছে পিছে পার্কিং লটে চললো ছেলেমেয়েরা।

রেজা জিজ্ঞেস করলো পলকে, 'ডক্টর রিচার কেমন আছে? অবস্থা কতোটা খারাপ?'

'ভালো না।'

'অ্যান্টিভেনিন কাজ করছে না?'

'আসেইনি এখনও।'

'কী? আসেনি! কেন?'

'নিয়ম-কানুন!' তিক্তকণ্ঠে বললো পল। 'বিষ, সিরাম, এসব জিনিস বর্ডার পার করতে হলে বিশেষ অনুমতির দরকার হয়। আজ রাত সাড়ে দশটা নাগাদ এসে যাওয়ার কথা।'

'খবর দেয়ার পর তো চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল!' সুজা বললো।

'হ্যাঁ। দপ্তরের ফাইল মানুষের জরুরী অবস্থা বোঝে না!'

পলকে গুডনাইট জানিয়ে ভ্যানে উঠলো ছেলেরা।

সুজার অনুরোধে পথে একটা স্ন্যাকবারে থামলো রেজা।

বার্গার চিবাতে চিবাতে আলোচনা চললো।

'ফ্যানের সুইচটা যখন পেলাম,' অ্যানি জানালো, 'পাগল হয়ে উঠেছে তখন অ্যালার্ম। দৌড়ে আসছে গার্ডেরা…'

'তিরিশজনের কম না,' বললো নিড।

'দুর, খালি বেশি কথা বলো!' ভাইকে ধমক লাগালো অ্যানি। 'তিরিশজন দেখলে কোথায়? তিনজন।…নিড ওদেরকে কি বললো জানো? রাতে জানোয়ারেরা কি করে ঘুমায় তাই দেখতে নাকি গিয়েছি। ইস্কুলের জন্যে রিপোর্ট তৈরি করবো।'

সুজা হাসলো। 'বিশ্বাস করেছে ওরা?'

'আরে দুর,' বাতাসে থাবা মারলো নিড। 'তাই কি করে নাকি? আমাদের আটকে রেখে সোজা গিয়ে পুলিশকে ফোন করলো। কয়েক মিনিট পরেই এসে হাজির পল নিউম্যান। আমাদের দেখে ওর চেহারা যা হয়েছিলো না, যদি দেখতে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে খাবারে কামড় বসালো সুজা। 'ফ্যানটা চালু হলো কি করে হঠাৎ? সুইচটা কোথায় ছিলো?'

অ্যানি জানালো।

রেজা বললো, 'অটোমেটিক সিসটেমে চলে হয়তো, বিরতি দিয়ে দিয়ে, যদি মেইন ব্রেকার বক্স থেকে কেউ চালু করে না দিয়ে থাকে। সন্দেহ বাড়ছে এখন আমার, ডক্টর রিচারের ব্যাপারটা আদৌ দুর্ঘটনা কিনা।'

'হ্যাঁ,' অ্যানি বললো, 'চুরিটা হওয়ার সময় মনে হচ্ছে একা ছিলেন না অফিসে। বললেই তো আবার আকরামের ঘাড়ে…'

আপেল পাই নিয়ে এলো ওয়েট্রেস। ঠিক এই সময় বলে উঠলো কেউ, 'আরে, আরে, আমাদের আকরাম খানের বন্ধুরা

না ?'

ফিরে তাকালো ছেলেরা। সুজা বললো, 'মিস্টার মরগান!'

'হ্যাঁ, আমিই,' নিজেই চেয়ার টেনে বসে পড়লো রিপোর্টার। রেজার প্লেট থেকে একটুকরো আলুভাজা তুলে নিলো।

এতো আন্তরিকতা পছন্দ হলো না রেজার, কড়া কিছু বলতে ইচ্ছে হলো, বললো না।

'কি চাই ?' ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সুজা। 'বানিয়ে-বুনিয়ে লিখে এমনিতেই তো একজনের সর্বনাশ করে দিয়েছেন; আবার কি ?'

'আমি আমার কাজ করেছি। তোমাদের বন্ধুকে কিছু লোক যদি পছন্দ করতে না পারে, সেটা কি আমার দোষ বলো ?'

'কেন, কার পাকা ধানে মই দিয়েছে আকরাম ?'

'আপনি ওভাবে লিখতে গেলেন কেন, মিস্টার মরগান ?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রেজা। 'এমনভাবে লিখেছেন, যেন ওর ওপর আপনার রাগ আছে। মিথ্যে কথাও কিছু কম লেখেননি।'

নির্লজ্জের মতো হাসলো রিপোর্টার। 'মানুষকে সাবধান করা আমার দায়িত্ব। কেউ পারমাণবিক বর্জ্য ফেলে স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে চাইলে যে কথা, কোনো উন্মাদ বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দিলেও একই কথা।'

জ্বলে উঠলো অ্যানির চোখ। 'মানুষকে খেপিয়ে তুলেছেন আপনি।'

'নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে,' যোগ করলো নিড। 'ন্যায়-অন্যায় নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আপনার। আপনি চেয়ে-

ছেন একটা রোমাঞ্চকর গল্প দিতে, পত্রিকার কাটতি বাড়াতে।'

'তোমাদের বন্ধুর কথা লেখাতেই এরকম রেগে যাচ্ছো,' ঠাণ্ডা হাসলো মরগান।

'আপনি আসলে কি চান, বলুন তো, মিস্টার মরগান?' প্রশ্ন করলো রেজা।

'প্রতিটি রিপোর্টার যা চায়। নাম। পত্রিকার কাটতি।'

'আমি জানতে চাইছি, এখানে কি চান?'

'আকরাম খানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে কোথায় তোমরা নিশ্চয় জানো।' ঘরের অন্যান্য টেবিলে চোখ বোলালো মরগান। 'ভালো টাকা দেবো।'

জবাবে অস্বস্তিকর নীরবতা।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো মরগান। একটা কার্ড টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'আমার ঠিকানা। মত বদলালে যোগাযোগ করো।'

লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলো ওরা। পাইয়ের প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিড বললো, 'খিদেই নষ্ট করে দিয়ে গেল ব্যাটা।'

কয়েক মিনিট পর, ভ্যান স্টার্ট দিচ্ছে রেজা, এই সময় একটা স্পোর্টস কার পাশ দিয়ে শাঁ করে গিয়ে ঢুকলো অন্য গাড়ির ভিড়ে।

'পিলারিটা না?' রেজা বললো। 'চিড়িয়াখানায় যেটা দেখেছিলাম?'

'হ্যাঁ,' সুজা বললো চিন্তিত ভঙ্গিতে. 'কার গাড়ি ওটা?

এখানকার কেউ নয়। তাহলে আগে একবার হলেও আমার চোখে পড়তোই।'

দ্রুত গাড়ি চালালো রেজা; স্পোর্টস কারের মালিক কে, দেখতে চায়। কিন্তু আর দেখতে পেলো না। চলে গেছে।

আধ ঘণ্টা পর নিজেদের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকলো রেজা। অ্যানি আর নিডকে তাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। আরেকটা গাড়ি চোখে পড়লো।

'আরি!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। 'ড্রেক ডানকান!'

'বাবার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন হয়তো,' ক্লান্ত কণ্ঠে রেজা বললো। 'কিংবা হয়তো আকরামের খোঁজ জানতে এসেছেন আমাদের কাছে।'

ভ্যান থেকে নেমেই স্থির হয়ে গেল সুজা। বড় বড় হয়ে গেল চোখ।

গ্যারেজের পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা মূর্তি। আকরাম খান!

আট

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে দুই ভাই।

অবশেষে সুজার মুখে কথা ফুটলো। 'আকরাম, কোথায় ছিলে তুমি? আমরা এদিকে চিন্তায় বাঁচি না।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদের দিকে এগিয়ে এলো আকরাম। 'তোমাদের দেখে যা খুশি হয়েছি না।'

চোখ ডললো রেজা।

ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে আকরামকে। কেমন বন্য হয়ে উঠেছে চেহারা।

'তোমার জন্যে খুব ভাবছিলাম,' রেজা বললো। তাকালো পুলিশের গাড়িটার দিকে। 'পুলিশ তোমাকে খুঁজছে।'

'জানি। মানে, আন্দাজ করেছি,' আকরাম বললো।

'ওদের ধারণা, তুমি পালিয়েছো। আকরাম, কোথায় গিয়েছিলে?'

'পালাইনি,' দ্বিধা করছে আকরাম। 'রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে বাস ধরে সোজা চলে গিয়েছিলাম ওশন বীচ। হেঁটেছি আর

ভেবেছি, ভেবেছি·আর হেঁটেছি। সময়ের খেয়াল ছিলো না।' বোকার মতো হাসলো। 'যখন খেয়াল হলো, দেখি, রাত। বাস বন্ধ। সারাটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে আমাকে।'

'ষোলো মাইল হেঁটে এসেছো!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা।

'সত্যি বলছি,' শুকনো গলায় বললো আকরাম। 'বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত। দেখি, বহু লোক জটলা করছে। দেখতে পেলে ধরে কি করতো কে জানে। ভয়ে আর ঢুকলাম না। চলে গেলাম শহরতলীতে। একটা সিনেমায় ঢুকলাম। ইস্!' গুঙিয়ে উঠলো সে। 'জুতো পায়ে এতদূর হেঁটেছো কখনো? ফোসকা পড়ে গেছে। সাংঘাতিক জ্বলে!'

হেসে উঠলো দুই ভাই। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেল আবার।

'আকরাম,' শান্তকণ্ঠে বললো রেজা,'ব্যাংকে তোমার অ্যাকাউন্টে দশ হাজার ডলার পেয়েছে পুলিশ। আর তোমাদের বেসমেন্টে দুটো গোখরো সাপ।'

কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে যেন আকরামের চোখ। 'আমাদের বেসমেন্টে গোখরো সাপ! আমার অ্যাকাউন্টে দশ হাজার ডলার!' রাগে কথা আটকে যাওয়ার অবস্থা হলো তার। 'কিভাবে? আমি···আমি···!' মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল হাত। 'আমাকে ফাঁসানোর জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে কেউ।'

আকরামের কাঁধে হাত রাখলো রেজা। ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিলো আকরাম। 'কে? কে করছে এসব?' চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'তোমরা তো নিশ্চয় আমাকে চোর ভাবছো!'

'শান্ত হও, আকরাম,' কোমল গলায় বললো রেজা। 'আমরা

তোমার বন্ধু, মনে রেখো।'

'সাপগুলো কিভাবে বেসমেন্টে গেল, আন্দাজ করতে পারছো কিছু?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'না।'

'তোমাকে বিশ্বাস করছি আমরা, আকরাম। সাপ রেখেছে, টাকা জমা দিয়েছে তোমাকে অপরাধী দেখানোর জন্যেই।'

বাড়ির দিকে হাত তুললো সুজা। 'এখন পুলিশ এসে বসে আছে। কি জন্যে?'

'ড্রেক ডানকান,' আকরাম বললো। 'আসতে দেখেছি আমি।' দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। 'আমি শিওর, আমাকেই খুঁজতে এসেছেন। কি যে করি!'

'কিছু করার নেই, আকরাম,' রেজা বললো। 'যা হয়, হবে। চলো দেখি, কি-জন্যে এসেছেন।'

লিভিং রুমে ঢুকলো তিনজনে। মিস্টার মুরাদ ওদের দেখে বলে উঠলেন, 'এই যে, ছেলেরা, বাইরে খুব ঠাণ্ডা, তাই না? অযথা এতোক্ষণ ওখানে কষ্ট করছিলে।'

সোফায় বসে আছেন ডানকান। আকরামের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

সুজার চোয়াল ঝুলে পড়লো। 'বাবা, তুমি জানলে কি করে? আকরামের কথা...'

হাসলেন মিস্টার মুরাদ। 'তোমাদের গাড়ির শব্দ শুনলাম। দেখলাম, গ্যারেজের ওপাশ থেকে কে যেন বেরিয়ে আসছে। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে কী আর এমন কষ্ট হয়?'

এবার আকরামের অবাক হওয়ার পালা। 'আপনি জানতেন, আমি ওখানে লুকিয়েছিলাম? তাহলে কেন এসে আমাকে ধরলেন না? পুলিশকে নাকি আমাকে খোঁজার আদেশ দেয়া হয়েছে।'

'অর্ডারটা ক্যানসেল করে দেয়া হয়েছে দশ মিনিট আগে,' বললেন চীফ। 'ফিরোজের অনুরোধে করেছি।...আকরাম, কয়েকটা প্রশ্ন করবো তোমাকে। ঠিক ঠিক জবাব দিও। প্রথমেই বলো, এতোক্ষণ ছিলে কোথায়?'

জবাব দিলো আকরাম।

আধ ঘণ্টা ধরে একের পর এক প্রশ্ন করে গেলেন ডানকান। জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেল আকরাম। শেষে তিনি বললেন, 'আকরাম, তোমার অ্যালিবাই খুব দুর্বল। প্রমাণ বলছে, তুমি দোষী। কিন্তু আমার মন বলছে, ওরকম গাধামী করার মতো বোকা তুমি নও। ফিরোজ আর তার ছেলেদের ধারণা, তুমি নির্দোষ। পল নিউম্যানও তোমার পক্ষ নিয়ে তর্ক করছিলো আমার সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'তোমাকে হাজতে ভরে রাখাই উচিত হতো। কিন্তু ফিরোজ মানা করছে। ও তোমার দায়িত্ব নিয়েছে।' কঠিন হলো তাঁর চোখের দৃষ্টি, 'শোনো, আকরাম, আমরা সবাই তোমার ভালো চাইছি। সত্যি সত্যি যদি দোষী হয়ে থাকো, মনে রেখো, আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না। ওদের মতো ভালো লোক,' তিন মুরাদকে দেখালেন চীফ, 'হয় না। যদি ওদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে থাকো...'

নিচ্ছি না, চীফ। কসম খেয়ে বলছি, কিচ্ছু করিনি আমি। এখন প্রমাণ করতে পারবো না, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি নির্দোষ।' ফিরোজ মুরাদের দিকে ফিরলো সে। ধরা গলায় শুধু বললো, 'আংকেল, ধন্যবাদ। অনেক করেছেন আমার জন্যে।'

'বন্ধু-বান্ধব থাকেই সে-জন্যে, আকরাম,' বললেন মিস্টার মুরাদ।

যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েও থেমে গেলেন চীফ। রেজা আর সুজাকে বললেন, 'দেখো, তোমরাও সাবধান। আমি আশা করবো, চিড়িয়াখানার ব্যাপারে আর নাক গলাবে না। বিপদে পড়বে শেষে। যা করার পুলিশই করবে, তোমরা আর যাবে না।'

ডানকান চলে গেলে ছেলেদের বললেন মিস্টার মুরাদ, 'নিশ্চয় খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে আজ।'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'হ্যাঁ।' চাপা গুড়গুড় শোনা গেল, মেঘ জমছে আকাশে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো সে। 'মনে হচ্ছে ভালোই নামবে। ভ্যানটা গ্যারেজে রেখে আসি।' কি ভেবে আকরামের দিকে তাকালো। 'তুমি আজ এখানেই থাকো।'

ছেলের সঙ্গে একমত হলেন মিস্টার মুরাদ, 'মন্দ বলোনি।'

'কিন্তু আমি আপনাদের বিরক্ত···

'আরে দুর,' হাত নাড়লো সুজা, 'কিসের বিরক্ত? থাকো, থাকো।'

'এ-বাড়িতে তুমি নিরাপদ,' রেজা বললো।

'তবে,' হেসে বললো সুজা, 'বিছানা পাবে না। কাউচেই

কাটাতে হবে রাতটা। ভ্যানে স্লিপিং ব্যাগ আছে, একটা নিয়ে এলেই হলো।'

'বেশ,' হাত ওল্টালো আকরাম। 'সবাই যখন বলছো···আমি রেজার সঙ্গে যাই। ব্যাগটা নিয়ে আসি।'

তিনজনেই বেরোলো। বিদ্যুতের শিখা চিরে দিলো যেন দক্ষিণের আকাশ। ভেসে এলো মেঘের গুমগুম। ঝড় আসছে। বৃষ্টি শুরু হয় হয়।

'এসে ভালোই হলো,' রেজা বললো। 'জানালা খুলে রেখে গিয়েছিলাম।'

'প্যাসেঞ্জার ডোর লক করা,' ভ্যানের কাছে পৌঁছে সুজা বললো। 'দাদা, চাবিটা দাও তো।'

'দিচ্ছি···আরে, চাবি কোথায় ফেললাম! পকেটে নেই তো!'

শাঁই শাঁই বইতে শুরু করলো ঝড়ো বাতাস। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো।

'কোথায় ফেললে?' জোরে বললো আকরাম, আস্তে বললে বাতাসের জন্যে শোনা যায় না। 'গাড়ির কাছে?'

ভ্যানের কাছে চত্বরে খুঁজতে লাগলো ওরা।

বিদ্যুৎ চমকালো। বাজ পড়লো আবার।

'নাহ্, কিচ্ছু দেখা যায় না,' সুজা বললো, 'এতো অন্ধকার।'

হঠাৎ আকাশের এমাথা-ওমাথা চিরে দিলো যেন বিদ্যুতের শিখা, ঝিলিক দিয়ে উঠলো তীব্র নীলচে-শাদা আলো। আলোকিত করে দিলো দশ দিক।

'পেয়েছি! চেঁচিয়ে উঠলো আকরাম। তুলে নেয়ার জন্যে

ঝুঁকলো। ছট করে একটা বিচিত্র শব্দ হলো। খোলা জানালা দিয়ে উড়ে গিয়ে কি যেন বিঁধেছে ভ্যানের ড্রাইভিং সিটে।

'কী ওটা?' সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করলো আকরাম।

'বুঝলাম না!' সতর্ক হয়ে উঠেছে রেজা। 'শব্দ শুনে মনে হলো...'

আবার বিদ্যুৎ চমকালো। বজ্রপাতের শব্দ কানে আসার আগেই আবার শোনা গেল বিচিত্র ছট। পরক্ষণেই ঠঙ করে কি যেন লাগলো ভ্যানের দরজায়, সুজার মাথার কয়েক ইঞ্চি তফাতে।

'ডার্ট!' চিৎকার করে উঠলো সে। 'ডার্ট ছুঁড়ছে!'

নয়

'মাথা নামাও!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিয়েই মাথা নিচু করে ফেললো রেজা, প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়লো মাটিতে। চাবিটা নিতে পারেনি আকরাম, খেয়াল করেছে সে। মাটিতে পড়েই আগে ওটা কুড়িয়ে নিলো।

খটাং করে ভ্যানে আঘাত হানলো আরেকটা ডার্ট। আধ-শোয়া হয়েই হাত বাড়িয়ে দরজার তালা খুলে ফেললো রেজা। মাথা নিচু রেখে শরীরটাকে মুচড়ে তুলে আনলো ড্রাইভিং সিটে। প্রায় একই সঙ্গে এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে জ্বেলে দিলো হেডলাইট। রিভার্স করে পিছাতে শুরু করলো। অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে দিলো যেন হেডলাইট। পাতাবাহারের ঝাড়ের আড়ালে একটা মূর্তিকে নুয়ে পড়তে দেখলো সে।

'ওই যে, ব্যাটা!' সুজাও দেখতে পেয়েছে। দৌড় দিলো। আকরামকে ডাকলো, 'জলদি এসো! পালিয়ে যাবে!'

'থামো, যেও না!' হুঁশিয়ার করলো রেজা।

কিন্তু সুজা শুনলো না। হারিয়ে গেল ঝাড়ের ওপাশে।

লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে রেজাও দৌড় দিলো। তার আগেই ছুটেছে আকরাম। রহস্যময় হামলাকারীকে তাড়া করলো ওরা।

পিছু নিয়ে চলে এলো এক অন্ধকার গলিপথে। বাতাসের শোঁ শোঁ আর বজ্রের চাপা গুমরানি ছাপিয়ে শোনা গেল শক্তিশালী এঞ্জিনের ভারি গুঞ্জন।

থমকে দাঁড়ালো সুজা। পাশে এসে দাঁড়ালো রেজা আর আকরাম। হাঁপাচ্ছে তিনজনেই। অন্ধকারে আবছামতো দেখা গেল গাড়িটাকে। হেডলাইট নিভানো। ছুটতে শুরু করেছে। চলে যাওয়ার আগেই বিদ্যুৎ চমকালো। ক্ষণিকের জন্যে স্পষ্ট চোখে পড়লো গাড়িটা।

'স্পোর্টস কার!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা। 'পিলারি!'

ওটাকে ধরার আর উপায় নেই। নিরাশ হয়ে ফিরলো ওরা। ভ্যানের কাছে আসতে আসতে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ড্রাইভিং সিটে উঠলো আবার রেজা। পাশের জানালাটা তুলে দিতে যাবে, পিঠে কি যেন লাগলো। গাড়ির ভেতরের আলো জ্বেলে দিয়ে ফিরে তাকালো, কি লাগছে দেখার জন্যে। সিটে বিঁধে রয়েছে একটা ডার্ট। লম্বা, সরু একটা টিউব, মাথায় ইনজেকশনের সুচের মতো সুচ। জিনিসটা দেখালো সঙ্গীদের।

'ট্র্যাঙ্কুইলাইজার ডার্ট!' চমকে গেল আকরাম। 'চিড়িয়াখানায় দেখেছি। বড় জানোয়ারের চিকিৎসা করার আগে এই ডার্ট ছুঁড়ে বেহুঁশ করে নেয়।'

'এটার ভেতরে কি ওষুধ আছে আল্লাহই জানে!' সুজা বললো।

'যাই থাক,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো আকরাম, 'আমরা

কোনোটাই শরীরে ঢোকাতে চাই না। অনেক দেরি হয়ে গেল। তবু, ডাক্তার বিগলকে একবার ফোন করা দরকার। ডার্টের ভেতরে কি আছে, তিনি বলতে পারবেন। ডক্টর রিচারের অবস্থা কেমন, তা-ও জানতে পারবো।'

সব কথা মিস্টার মুরাদকে জানালো ছেলেরা। হাসপাতালে ফোন করলো। তারপর বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লো ভ্যানে করে।

'কেউ আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছে,' রেজা বললো। 'নিশ্চয় আমরা ঠিক পথে এগোচ্ছি···,' জোরে মাথা ঝাঁকালো সে। 'কি যেন খচখচ করছে মনে। ধরেও ধরতে পারছি না।'

মেডিক্যাল সেন্টারে পৌঁছে পার্কিং লটে গাড়ি রাখলো রেজা। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ডক্টর বিগল। 'বোধহয় বাঁচাতে পারলাম না।' ছেলেদের দেখেই বললেন তিনি, শান্ত-কণ্ঠ। চোখের চারপাশে কালিমা। ওদেরকে নিয়ে অফিসে চললেন।

আকরাম জিজ্ঞেস করলো, 'অ্যান্টিভেনিন কাজ করছে না?'

চোখ মুদলেন ডাক্তার। 'আসেইনি এখনও।'

'কী?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো রেজা। 'কেন?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। 'কাগজপত্র রেডি করতে পারেনি।' ফোন বাজলো। তুলে নিলেন তিনি। নীরবে শুনলেন ওপাশের কথা, জিজ্ঞেস করলেন, 'শিওর?···গুড··· থ্যাংকস।' রিসিভার রেখে দিলেন। চওড়া হাসি ফুটেছে মুখে। 'এলো অবশেষে। অ্যান্টিভেনিন এখন এয়ারপোর্টে। গাড়ি নিয়ে

রওনা হয়ে গেছে লোক, কয়েক মিনিটেই এসে যাবে।'

রেজার দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'ফোনে ডার্টের কথা কি যেন বলছিলে?'

ডার্টটা দিলো রেজা।

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ডাক্তার। সতর্ক রইলেন, যাতে সুচ না ফুটে যায়। 'পেলে কোথায়?'

'আমাদের বিঁধতে চেয়েছিলো একজন,' জবাব দিলো সুজা।

'এতে কি আছে জানতে চাই,' রেজা বললো।

'হুম্‌ম্‌,' বিড়বিড় করলেন ডাক্তার। ঘড়ি দেখলেন। 'সিরাম আনতে আরও কয়েক মিনিট লাগবে। চলো, ততোক্ষণে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কম্পিউটারে পরীক্ষা করে নিই।'

ডাক্তারকে অনুসরণ করে রিসার্চ ল্যাবে ঢুললো ছেলেরা।

ছোট একটা কাচের শিশিতে ডার্ট থেকে কয়েক ফোঁটা তরল ঢাললেন তিনি। বিশাল এক কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত একটা সিলিণ্ডারে ঢুকিয়ে দিলেন শিশিটা। 'যা যা করার কম্পিউটারই করবে এখন,' ছেলেদের জানালেন।

সন্দেহ জাগলো সুজার চোখে। 'এতোই যদি সহজ, ডক্টর রিচারের রক্ত পরীক্ষা করছেন না কেন? শিশিতে করে ঢুকিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়।'

'না, হয় না, সুজা। এখানে পিওর স্যাম্পল পাওয়া গেছে, তাই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাপের বিষ রক্তের সাথে মিশে গিয়ে বদলে যায়। তার ওপর, ডক্টর রিচারের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে দিয়েছে। তবুও চেষ্টা

করেছি, কাজ হয়নি।'

হঠাৎ কি মনে পড়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। 'হায় হায়, ডিউটি নার্সকে বলতে ভুলে গেছি, অ্যান্টিভেনিন আসছে। ডক্টর রিচারকে ইঞ্জেকশন দেয়ার জন্যে তৈরি করা দরকার। রিসিভার তুলে ডায়াল করতে গিয়েই খটাস করে নামিয়ে রাখলেন আবার। 'এহ্‌হে, প্লাগ খোলা। ডক্টরের রুমের কানেকশন আমিই কেটে রাখতে বলেছিলাম।'

'কেন?' আকরাম জিজ্ঞেস করলো।

'কিছুক্ষণ থেকেই বিরক্ত করছে এক রিপোর্টার, ডক্টরের সঙ্গে কথা বলতে চায়। ফোন তুলতে তুলতে বিরক্ত হয়ে গেছে নার্স। আমিই বলেছি শেষে লাইন কেটে রাখতে। এই রিপোর্টারগুলো-কে নিয়ে আর পারা যায় না, জোঁকের চেয়ে খারাপ···আমাকেই যেতে হবে এখন ডক্টরের কেবিনে।'

পরস্পরের দিকে তাকালো ছেলেরা।

'মরগান!' রাগে মুখ কালো করে ফেলেছে সুজা।

অবাক হলেন ডাক্তার। 'হ্যাঁ, এই নামই তো বললো। এখন কম্পিউটারে কাজটা না সেরে যাই-ই বা কি করে, আবার না গেলে-ও নয়।'

'আমরা কিছু করতে পারি?'

'উঁ, তা পারো। কেবিনে গিয়ে নার্সকে বলতে হবে, দশ-পনে-রো মিনিটের মধ্যে সিরাম এসে যাবে।'

'এখুনি যাচ্ছি।'

'আমিও আসছি,' সুজাকে বললো রেজা। 'তাড়াহুড়ো আর

এই উত্তেজনায় মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। চাবিটা ফেলে এসেছি ভ্যানে। চুরি না হলেই এখন বাঁচি।'

বাড়িটার সামনের অংশে একটা হলঘর। সেখান থেকে একটা পথ চলে গেছে ওয়ার্ডের দিকে, আরেকটা বাইরে বেরোনোর পথ। হলে ঢুকতেই দেখলো, তাড়াহুড়ো করে আসছে একজন লোক, অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার। ওকেই এয়ারপোর্টে পাঠানো হয়েছিলো।

'অ্যান্টিভেনিন এনেছেন?' জিজ্ঞেস করলো সুজা।

মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

'তাহলে এখুনি গিয়ে নার্সকে জানাতে হয়,' বলেই ওয়ার্ডের দিকে ছুটলো সুজা।

পেছন থেকে ডেকে বললো লোকটা, 'ফ্রিজে করে এসেছে জিনিসটা, এখনও ফ্রিজেই রাখা। এই অবস্থায় শরীরে ঢোকালে নির্ঘাত মারা যাবেন। কয়েক মিনিট বাইরে রেখে গরম করে নিতে হবে।'

ফিরে তাকালো না সুজা। চলতে চলতেই মাথা নেড়ে সায় জানালো।

রেজা ডেকে বললো, 'চাবিটা নিয়েই আমি চলে আসছি, সুজা।'

মন দিয়ে সুজার কথা শুনলো ডিউটি নার্স। বললো, 'ডাক্তারকে গিয়ে চিন্তা করতে মানা করো, সব ঠিক করে ফেলছি আমি। গিয়ে বলো, পারলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিক। আমিই সিরাম পুশ করতে পারবো।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরলো সুজা।

রেজা এখনও আসেনি।

রিসার্চ ল্যাবের দরজা খুলেই চমকে গেল সুজা। নিথর হয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন ডক্টর বিগল। তাঁর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আকরাম, দরজার দিকে পিঠ। ঝড় বয়ে গেছে যেন ল্যাবরেটরিতে, কম্পিউটারের পাশে একটা প্লেটে রাখা ছিলো ডার্টটা, এখন নেই।

হঠাৎ এদিকে ফিরলো আকরাম। কপালের কাটা থেকে রক্ত ঝরছে। সর্বনাশ, এ-কি চেহারা ওর! চুল এলোমেলো। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। হাতে একটা ভারি ইস্পাতের বোতল, ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার হয় ওই জিনিস।

দশ

'কি হয়েছে, আকরাম ?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'আ-আমি···,' হাতের বোতলটার দিকে চেয়ে থেমে গেল আকরাম।

একটা পেপার টাওয়েল ডিসপেনসার থেকে কয়েকটা পাতা বের করে আনলো সুজা। 'নাও, ধরো, কপালের রক্ত মোছো।'

কাঁপা হাতে কাগজগুলো নিয়ে সিংকের দিকে এগোলো আকরাম।

হাঁটু গেড়ে সুজা বসলো ডাক্তার বিগলের পাশে। হাত তুলে নাড়ি দেখলো।

রক্ত ধুয়ে ফিরে এলো আকরাম। 'সুজা, আমি···আমি···।' মেঝেতে ফেলে রাখা বোতলটার দিকে চেয়ে কেঁপে উঠলো সে। 'সত্যি বলছি, আমি কিছু করিনি।'

'সেসব কথা পরে হবে,' শান্তকণ্ঠে বললো সুজা। ডাক্তারকে আলতো নাড়া দিয়ে বললো, 'ডক্টর, শুনছেন ? মিস বিগল ?'

গুঙিয়ে উঠলেন ডাক্তার। চোখের পাতা কাঁপলো। 'কি ? কি

হয়েছে ?' উঠে বসার চেষ্টা করলেন। 'ইস্, মাথায় এতো ব্যথা কেন !'

ডাক্তারকে উঠতে সাহায্য করলো সুজা। ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসালো। এক গেলাস পানি এনে দিলো তাঁকে। তারপর ফিরলো আকরামের দিকে, 'এবার বলো।'

'ডেস্ক থেকে কয়েকটা কাগজ এনে দিতে বললেন ডাক্তার। হলে ঢুকতেই কে জানি বাড়ি মারলো মাথায়। পিছলে এসে লাগলো কপালে···,' কাটা দাগটায় আঙুল ছোঁয়ালো আকরাম। 'বেহুঁশ হয়ে গেলাম। হুঁশ ফিরলে দেখলাম, চোখ ভিজে গেছে রক্তে। তাড়াতাড়ি উঠে দৌড়ে এলাম এখানে। দেখি, মাটিতে পড়ে আছেন ডাক্তার।' বোতলটা দেখালো। 'ওটা পড়েছিলো তাঁর পাশে। দেখার জন্যে তুলেছি, এই সময় তুমি ঢুকলে। ···যে আমাকে মেরেছে, সে-ই হয়তো ডাক্তারকেও মেরেছে। জানি না···।' থেমে দম নিলো। মৃদু হাঁপাচ্ছে। মুখে হাত বোলালো। 'আর কিছু জানি না আমি, সুজা।'

ঘরে এসে ঢুকলো রেজা। 'কি হয়েছে ?'

'মাথায় বাড়ি মেরেছে,' আকরাম বললো। 'আমাকেও। ডাক্তারকেও।'

'ডার্টটাও নিয়ে গেছে,' শূন্য প্লেটটা দেখালো সুজা।

'নিয়ে গেছে ?' রক্ত ফিরে আসতে শুরু করেছে ডাক্তারের মুখে। ম্লান হাসলেন। 'নিক। ওটা নিয়েই যদি মনে করে থাকে, যা লুকানোর লুকিয়ে ফেলেছে, ভুল করেছে। কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে নমুনা, আগেই। এতোক্ষণে রিপোর্ট তৈরি হয়ে

যাওয়ার কথা…।' তাঁর কথার সমর্থন জানাতেই যেন মৃদু বিপবিপ করে উঠলো যন্ত্র। ক্যাটক্যাট করে চালু হয়ে গেল প্রিন্টার। থামলো। কাগজটা ছিঁড়ে নিলেন ডাক্তার। দেখতে দেখতে বিস্ময়ের ভাঁজ পড়লো কপালে। 'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করলেন। অজান্তে হাত চলে গেল মাথার পেছনে, গোলআলুর মতো ফুলে উঠেছে যেখানটায়।

'কি আশ্চর্য?' সুজা জানতে চাইলো।

ভাঁজ আরও গভীর হলো। 'গোখরোর বিষ আর খুব কড়া ট্র্যাংকুইলাইজারের মিশ্রণ!'

'সাপের বিষের সঙ্গে ট্র্যাংকুইলাইজার!' অবাক হয়ে বিড়বিড় করলো আকরাম। 'মারাত্মক নিশ্চয়?'

'সাংঘাতিক! রক্তে ঢুকিয়ে দিলে ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে যায় মানুষকে মৃত্যুর দিকে…'

'পেয়েছি!' তুড়ি বাজালো রেজা। 'এটাই খচখচ করছিলো মনে, ধরেও ধরতে পারছিলাম না। ডার্টটা যেখানে বিঁধেছিলো, গাড়ির সিটে একটা ছোট ছিদ্র হয়েছে, সাপের কামড়ের ফুটোর মতো। যদি সাপটার একটা দাঁত হয়। বুঝেছেন কিছু?' জবাবের আশায় না থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, 'ডক্টর রিচারকে সাপে কামড়ায়নি, মিস বিগল। ডার্ট ছোঁড়া হয়েছিলো। ডেস্কের ওপরে ভেণ্টে বসে, ডার্টগান দিয়ে।'

'নিশ্চয়ই!' নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে সুজার। 'ঘাড়ের পেছনে এক ফুটোর এটাই ব্যাখ্যা…'

'এবং সমস্ত লক্ষণ…!' বাধা দিয়ে বললেন ডাক্তার। 'সর্বনাশ!'

চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'কী ?' রেজা জানতে চাইলো।

'থামাতে হবে। এখুনি !' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। টলতে টলতে এগোলেন দরজার দিকে।

'কে ? কাকে থামাতে হবে ?' পেছন থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো রেজা।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ডাক্তার। হাঁটার শক্তি নেই। হাঁপাতে লাগলেন। 'নার্স। ডক্টর রিচার !' এইটুকু বলেই জিরিয়ে নিলেন। 'অ্যান্টিভেনিন ইনজেকশন দেয়া বন্ধ করতে হবে!' ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো শরীর। হাঁপানোর ফাঁকে ফাঁকে কাঁপা গলায় বললেন, 'টাইগার স্নেকের অ্যান্টিভেনিন আনা হয়েছে। ইনজেকশন দিলেই মরবেন।'

'সুজা,' জরুরী কণ্ঠে বললো রেজা, 'জলদি পুলিশকে ফোন কর। মিস বিগলকে দেখিস,' বলেই ছুটে বেরোলো ঘর থেকে। পিছু নিলো আকরাম। তারও শরীর দুর্বল, আঘাতের ধাক্কা কাটাতে পারেনি এখনও পুরোপুরি। ফলে পিছিয়ে পড়লো সে।

অবাক হয়ে রেজার দিকে তাকাচ্ছে হাসপাতালের কর্মীরা। পরোয়াই করলো না রেজা। এক ধাক্কায় ডক্টর রিচারের কেবিনের দরজা খুলে ঢুকলো। শাদা ডাক্তারী পোশাক আর মুখোশ পরা একজন রিচারের বাহুতে সুচ ঢোকাতে যাচ্ছে।

চেঁচিয়ে তাকে নিষেধ করলো রেজা। 'থামুন, থামুন !'

পাঁই করে ঘুরলো শাদা পোশাক।

আরে, এ-তো তখনকার সেই ডিউটি নার্স নয়। বুঝে ফেললো

রেজা। জিজ্ঞেস করলো, 'কে আপনি ?'

ঘরের কোণ থেকে গোঙানি শোনা গেল। চোখের কোণ দিয়ে রেজা দেখলো, মেঝেতে পড়ে আছে ডিউটি নার্স।

রিচারের বেডের পাশে রাখা একটা ভারি ট্রে তুলে ছুঁড়ে মারলো লোকটা। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেললো রেজা, কিন্তু কাঁধ বাঁচাতে পারলো না। বেশ জোরে এসে লাগলো ট্রে-টা। সামলে নেয়ার আগেই লাফ দিয়ে এসে পড়লো লোকটা। হাতের সিরিঞ্জটা ছুরির মতো ধরে ঘাঁই মেরে ঢোকানোর চেষ্টা করলো রেজার ঘাড়ে।

কাত হয়ে গেল রেজা। বুঝে গেছে, ওই সুই শরীরে ঢুকলে আর বাঁচতে হবে না। পা চালালো সে। কিন্তু বেকায়দাভাবে কাত হয়ে থেকে ঠিকমতো লাগাতে পারলো না।

লাফিয়ে সরে গিয়ে স্যালাইনের ব্যাগ ঝোলানোর একটা স্ট্যাণ্ড তুলে বাড়ি মারলো লোকটা। লাগাতে পারলো না। সরে গেছে রেজা। সরেই, পাশ কাটিয়ে এসে রদ্দা মারলো লোকটার ঘাড়ে।

দরজার কাছে চলে এসেছে দু'জনে। লোকটার সিরিঞ্জধরা হাতটা চেপে ধরে জোরে দরজার পাল্লায় বাড়ি মারলো রেজা। ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো লোকটা, হাত থেকে ছেড়ে দিলো সিরিঞ্জ।

লোকটাকে দরজার সঙ্গে চেপে ধরার চেষ্টা করছে এখন রেজা।

সজোরে পা উঠে এলো লোকটার, হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারলো রেজার তলপেটে। হুঁক করে উঠলো রেজা। তীব্র ব্যথায় হাঁ হয়ে গেছে। শ্বাস টানতে পারছে না। এই সুযোগে ঝাঁকি দিয়ে

হাত ছাড়িয়ে নিলো লোকটা। একটানে পাল্লা খুলে বেরোতে গিয়ে ধাক্কা খেলো আকরামের গায়ে। ঠেলে ওকে দেয়ালে ফেলে দৌড় দিলো বারান্দা ধরে।

কেবিনে ঢুকলো আকরাম। টলছে। 'রেজা, কি হয়েছে?'

সামনের দিকে বাঁকা হয়ে আছে রেজা। পেট চেপে ধরেছে দু'হাতে। 'ধরতে গিয়েছিলাম ব্যাটাকে। পারলাম না···।' কোলা-ব্যাঙের স্বর বেরোলো গলা দিয়ে। 'ডক্টর রিচারকে খুন করতে এসেছিলো।'

আর শোনার অপেক্ষা করলো না আকরাম। ছুটে বেরিয়ে গেল।

মুহূর্ত পরে সুজার কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার বিগল। পেছনে হাসপাতালের তিনজন গার্ড। ওদের পেছনে আরেকজন ডাক্তার, বার বার বলছেন, মিস বিগলের চিকিৎসা দরকার। কানেই তুললেন না ডাক্তার বিগল। মেঝেতে পড়ে থাকা নার্সকে দেখেই অনুমান করে নিলেন অনেক কিছু। হঠাৎ যেন শক্তি ফিরে এলো তাঁর দেহে। ছুটে গেলেন বিছানার কাছে। দ্রুত অথচ অভিজ্ঞ হাতে পরীক্ষা করলেন রিচারকে।

তখনও সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে রেজা। যন্ত্রণায় বিকৃত চোখ-মুখ। তাড়াতাড়ি জানালো, কি ঘটেছে।

'আরেকটু হলেই মরেছিলেন ডক্টর!' ডাক্তার বিগল বললেন। 'অবস্থা এমনিতেই খুব খারাপ। ইনজেকশনটা দিলে এতোক্ষণে শেষ হয়ে যেতেন।' বিষণ্ণ হাসলেন। 'চিড়িয়াখানায় ফোন করতে হবে। একটা গোখরোর দুধ দুইয়ে নিয়ে আসুক। আমাদের

ল্যাবরেটরিতেই অ্যান্টিভেনিন তৈরি করে নিতে পারবো। বেশি-ক্ষণ লাগবে না। রোগ যখন ধরতে পেরেছি, আর অসুবিধে নেই।' বিছানায় পড়ে থাকা ফ্যাকাশে মুখটার দিকে তাকালেন। 'ডক্টর বাঁচবেন।'

'এ-ও ভালো হয়ে যাবে,' বললেন আরেক ডাক্তার। নার্সকে ধরে দাঁড় করিয়েছেন।

ফিরে এলো আকরাম। হাঁপাচ্ছে। 'ধরতে পারলাম না হারাম-জাদাকে। কি গাড়িতে এসেছে, আন্দাজ করতে পারো?'

'আগুনরঙা পিলারি!' একসঙ্গে বলে উঠলো দুই ভাই।

মাথা নাড়লো আকরাম। 'হয়নি। চিড়িয়াখানার একটা স্টাফ কার।'

'বাহ্, তাই নাকি?' রেজা বললো। 'জোড়া লাগতে শুরু করেছে অবশেষে। প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিলো, চোরের সহকারী আছে। তাদের অন্তত একজন চিড়িয়াখানার লোক। ওখানেই ট্র্যাংকুইলাইজার গান জোগাড় করা সহজ। আর চিড়িয়াখানার স্টাফ কারও ওখানকার লোকের পক্ষেই বের করা সহজ।' ভ্রূকুটি করলো সে। 'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কাকে সন্দেহ করবো? ছোট্ট একটামাত্র সূত্র আছে আমাদের হাতে। লোকটার বদভ্যাস জানি, ব্যস। কাগজ হাতে থাকলেই ভাঁজ করে।'

'আরও একটা ব্যাপার এখন পরিষ্কার,' সুজা বললো। কয়েক জোড়া আগ্রহী চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। 'ডক্টর রিচারকে খুনের চেষ্টা করার একটাই অর্থ। তিনি বেঁচে গেলে অসুবিধেয় পড়ে যাবে চোর। হয়তো তাকে চিনে ফেলেছেন তিনি।'

একঘণ্টার মধ্যেই রায় দিয়ে দিলেন ডক্টর বিগল, রিচারের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। 'বিপদ কাটলো!' বলে হেলান দিলেন চেয়ারে। হাসপাতালের ক্যাফিটেরিয়ায় অপেক্ষা করছিলো রেজা, সুজা আর আকরাম, সেখানেই এসেছেন তিনি। 'হুঁশ ফিরতে কদিন লাগে বলা যায় না। তবে ওষুধে সাড়া দিয়েছে শরীর।' এক মুহূর্ত থেমে বললেন, 'তোমরা তাঁর প্রাণ বাঁচালে।'

প্রশংসা এড়িয়ে গিয়ে রেজা জিজ্ঞেস করলো, 'গাড়িটার কি খবর? পুলিশ শনাক্ত করতে পেরেছে?'

'পুলিশ খোঁজ নিয়েছে। সব ক'টা গাড়িই জায়গামতো আছে। তবে,' মাথা ডললেন ডাক্তার বিগল,'হাসপাতাল থেকে চিড়িয়াখানা বেশি দূরে না। গিয়ে হয়তো আবার রেখে দিয়েছে গাড়িটা। কারো চোখে পড়েনি। অনেক গাড়িই ঢোকে-বেরোয়, দারোয়ানের অতো মনে থাকার কথা না।'

এক কাপ গরম চকোলেট নিয়ে এলো ওয়েট্রেস। তাতে চুমুক দিলেন ডাক্তার। কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'একটা কথা জোর নিয়ে বলা যায়, তোমাদের চোর সাপ বিশেষজ্ঞ।' ছেলেদের বিস্মিত দৃষ্টি দেখে মুচকি হাসলেন। 'সাপ নাড়াচাড়া খুব বিপজ্জনক। বিষের জন্যে যারা ওগুলোকে চুরি করতে পারে, তারা নিশ্চয় জানে কি করে সামলাতে হয়। টাইগার স্নেকের মতো সাপ ঘাঁটাঘাঁটি সহজ ব্যাপার নয়।...ভয়ংকর লোকের বিরুদ্ধে লেগেছো তোমরা।'

চকোলেট শেষ করে উঠলেন ডাক্তার। ছেলেদের সঙ্গে এগোলেন। পার্কিং লটের কাছে এসে থেমে হুঁশিয়ার করলেন, 'খুব

সাবধানে থাকবে।'

ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠলো ছেলেরা।

বাড়ি ফেরার পথে তৃতীয়বার ভাইকে জিজ্ঞেস করলো সুজা, 'লোকটাকে সত্যিই চিনতে পারোনি?'

'কি করে চিনবো? গায়ে অ্যাপ্রন, মুখে মুখোশ।' পেট ডললো রেজা, এখনও ব্যথা করছে। 'তবে একটা কথা বলতে পারি, ব্যাটার গায়ে জোর আছে।'

'তা তো নিশ্চয়। নইলে ভেন্টের ভেতর দিয়ে একা একা সাপের খাঁচা টেনে তোলে কি করে?'

'মরুকগে, হারামজাদা!' আকরাম বললো। 'তোমাদের খবর জানি না। কিন্তু আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

'ঘুম?' সুজা বললো। 'এই অবস্থায় ঘুম পায় কি করে তোমার?'

'জানি না,' গুঙিয়ে উঠলো আকরাম। 'শরীরে আর সইছে না আমার। ভেঙে পড়তে চাইছে।'

গ্যারেজের সামনে ভ্যান থামালো রেজা। পানি জমে আছে এখানে ওখানে।

সাবধানে থেকেও পানিতে পা দিয়ে ফেললো সুজা। 'দুর, দিলাম ভিজিয়ে!'

'একটা ভুল হয়ে গেল,' আকরাম বললো। 'তখন লোকটার পায়ের ছাপ খোঁজা উচিত ছিলো।'

কথাটায় গুরুত্ব দিলো না সুজা। কিন্তু রেজা ড্রাইভারের সিট থেকে নামতে নামতে গম্ভীর হয়ে গেল। ড্রাইভওয়ের দিকে চেয়ে

আনমনে বললো, 'পাতাবাহারগুলো যথেষ্ট উঁচু, ঘন। সরাসরি বৃষ্টির ফোঁটা না পড়লে ছাপ থেকেও যেতে পারে।'

'দেখবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'ক্ষতি কি?'

ভ্যানের পেছন থেকে একটা বড় টর্চ বের করলো সুজা। 'চলো।'

বেড়ার কাছে চলে এলো তিনজনে। গ্যারেজের সামনের চেয়ে এখানে পানি আরও বেশি জমেছে। তবে জায়গাটা সমান নয়, কোথাও কোথাও দ্বীপের মতো জেগে রয়েছে উঁচু অংশগুলো।

'নাহ্, ধুয়েই গেছে,' হতাশ কণ্ঠে আকরাম বললো।

'ওই যে,' দেখালো রেজা, 'ডাল ভেঙে রয়েছে। নিশ্চয় ওখানেই লুকিয়েছিলো।'

কয়েক পা এগিয়ে আলো ফেলেই চেঁচিয়ে উঠলো সুজা, 'কসম!'

এগারো

মাটিতে পড়ে রয়েছে একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ। ভেজা, কাদায় মাখামাখি। পাশে একটা পায়ের ছাপ। চোখ মিটমিট করলো সুজা। 'এরকম জিন্দেগীতে দেখিনি।'

ছাপটা সত্যি অদ্ভুত। একেবারে সমান। জুতোর আগাও নেই, গোড়ালিও নেই।

'স্লিপার পরেই চলে এসেছিলো নাকি?' রেজা বললো।

ঝুঁকে দাগগুলো দেখছে আকরাম। 'ক্লিন-রুম সোল!'

'ক্লিন-রুম সোল? সেটা আবার কি?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'ল্যাবরেটরির একটা অংশকে বলা হয় ক্লিন-রুম, যেখানে সমস্ত জায়গা জীবাণু-নিরোধক করে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে।' জুতোর ছাপ দেখালো আকরাম। 'ওই জুতোর ডিজাইনই করা হয়েছে ওভাবে-বিশেষ কারণে। গোড়ালি নেই। কোনোরকম খাঁজ নেই, যাতে ময়লা আটকাতে পারে, জীবাণু থাকতে পারে।'

'তারমানে আরেকটা সূত্র ফেলে গেল।'

সুজার হাত থেকে টর্চ নিয়ে আশপাশে আলো ফেললো রেজা।

আরও ছাপ দেখা গেল। বেশির ভাগই ধুয়ে গেছে বৃষ্টিতে, তবে এখনও যা রয়েছে, অনুসরণ করা চলে। ছাপ ধরে ধরে পাতা-বাহারের বেড়া ঘুরে পেছনের রাস্তায় চলে এলো ওরা, যেখানে স্পোর্টস কারটা দাঁড়িয়ে ছিলো।

'এই ব্যাটাকেই দরকার আমাদের,' ফেরার পথে বললো রেজা।

প্রথম ছাপটার কাছে ফিরে এসে মাটি থেকে ভাঁজ করা কাগজটা তুলে নিলো সুজা। 'দেখি, আলো ফেলো তো এর ওপর।' ভেজা কাগজ, সাবধানে খুলতে হলো, নইলে ছিঁড়ে যায়। একটা রশিদ। ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, রেপটাইল ল্যাবরেটরি। নিচে ঠিকানা, ১২১১ মিডোল্যাণ্ডস রোড, জারসি সিটি, নিউ জারসি। কতগুলো মেডিক্যাল সাপ্লাইয়ের বিল লেখা রয়েছে। সরবরাহ করা জিনিসের মধ্যে সাপের বিষও রয়েছে।

'নিউ জারসি?' ভুরু কোঁচকালো রেজা। 'এক মিনিট! ফুটবল টিকেটটার কথা মনে আছে? ডক্টর রিচারের অফিসে যেটা পেয়েছিলাম? মিডোল্যাণ্ডস স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা ছিলো সেদিন, তার টিকেট।'

সুজা বললো, 'তাহলে দুটো জিনিস পেলাম আমরা। একটা ফুটবল খেলার টিকেট, আরেকটা বিষ সরবরাহের রশিদ। এবং দুটোই নিউ জারসির মিডোল্যাণ্ডে।'

মাথা ঝাঁকালো আকরাম। 'ক্লিন-রুমে ব্যবহারের জিনিসপত্র মেডিক্যাল সাপ্লাই ল্যাবরেটরিতেই পাওয়া যায়।'

'তারমানে মিডোল্যাণ্ডে গেলে কিছু প্রশ্নের জবাব পাওয়াও যেতে পারে?' ঘড়ি দেখলো রেজা। 'চলো, গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

কাল সকালেই যাবো।'

'হয়তো,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে আকরাম, 'ওই হারামজাদা-কেও ধরতে পারবো। যে এতো জ্বালান জ্বালাচ্ছে। ওর সঙ্গে পনেরো মিনিট একা কাটানোর ইচ্ছে আমার।' হাত মুঠো করে ফেললো সে।

আকরামের পেশিবহুল শক্তিশালী বাহুর দিকে চেয়ে হাসলো সুজা। 'হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে। মানে তুমিই কাটাও আরকি। ব্যাটার কপালে খারাবি আছে তাহলে। কিন্তু ওকে খুঁজে বের করার আগে আরও কাজ আছে আমাদের।' গ্যারেজে গিয়ে ঢুকলো সে। বেরিয়ে এলো এক কাপ শাদা পাউডার নিয়ে। ট্যাপের দিকে এগোলো।

কল থেকে পানি ভরে আনলো কাপে।

আকরাম বললো, 'প্লাসটার?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো সুজা। 'ছাপটার মডেল বানাবো। ব্যাটার বিরুদ্ধে যতোটা সম্ভব প্রমাণ জোগাড় করা দরকার।'

পায়ের ছাপে তরল প্লাসটার ঢাললো সুজা। 'শুকাক। চলো, আমরা গিয়ে ঘুমাই। সকালে তুলে নেয়া যাবে।'

দিন ভালো থাকলে বড়জোর দু'ঘণ্টার পথ। কিন্তু সকালটা খারাপ। মেঘলা ভাব কাটেনি। থেকে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসও আছে। দশটার আগে কিছুতেই পৌঁছতে পারলো না ওরা।

নিউ জারসিতে ঢোকার মুখে সাইনবোর্ড। ঘন কুয়াশা। আব-ছামতো দেখা গেল লেখাগুলো।

পথের পাশের একটা রেস্টুরেন্টে নাস্তা করতে ঢুকলো ওরা। পিটপিট করে বৃষ্টিও পড়তে আরম্ভ করেছে। কুয়াশা তো আছেই। পার্কিং লটে আরেকটা বিশাল গাড়ি ঢুকতে দেখলো, ছয় চাকার ট্রাক। গায়ে বড় বড় করে লেখা: রেপটাইল ল্যাবরেটরি, জারসি সিটি, নিউ জারসি।

নাস্তা সেরে আবার ভ্যানে চড়লো ওরা।

রাস্তায় এখন খানিক পর পরই কমলা রঙের সাইনবোর্ড, হুঁশিয়ারি—সামনে রাস্তার কাজ চলছে।

'কি ভাবছো, রেজা?' বাইরের কুয়াশার দিকে চেয়ে বললো আকরাম। 'ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কি জিজ্ঞেস করবে? নিশ্চয় বলবে না, এই মিয়ারা, কে সাপ চুরি করেছো, কে রিচারকে খুন করতে গেছো?'

রেজা হাসলো। 'ওরকম জিজ্ঞেস করে জবাব পেলে তো ভালোই হতো। কিন্তু বলবে তো না।' মলিন হয়ে এলো হাসি। 'ওখানে গিয়েও পাবো কিনা জানি না। সকালে ডাক্তার বিগলকে ফোন করেছিলাম। তিনি জানালেন, ইউনিভারসিটি মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারও রেপটাইল ল্যাবের কাস্টোমার। বিশেষ ধরনের ওষুধ কেনে ওদের কাছ থেকে।' মাথা নাড়লো সে। 'যদি বেআইনী কিছু করেও, জানা কঠিন হবে।'

'আমি ভাবছিলাম···,' বলতে গিয়ে থেমে গেল সুজা।

প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে ভ্যানের গায়ে।

'দাদাআ!' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা।

বিশাল এক দৈত্যের মতো ঘন কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে

এলো লরিটা। বিপজ্জনক ভাবে সরে এসে আবার ধাক্কা মারলো ভ্যানের গায়ে।

কন্ট্রোল ঠিক রাখতে হিমশিম খাচ্ছে রেজা। ধাক্কা লেগে পড়ে গেল একটা কমলা রোডসাইন। পাশে গভীর খাদ। সেদিকেই সরে যাচ্ছে ভ্যান। লরিটা আরেকবার ধাক্কা দিলেই···

কিন্তু আর দিলো না।

লরির গায়ে নাম দেখে বড় বড় হয়ে গেল সুজার চোখ। 'রেপ-টাইল ল্যাবরেটরি।'

দ্রুত চলে গেল লরিটা। হারিয়ে গেল কুয়াশায়। আবার পথে উঠে গতি বাড়িয়ে ওটার পিছু নিলো রেজা। কিছুদূর এগোতে না এগোতেই কানে এলো পুলিশের সাইরেন।

বারো

থামতে বাধ্য হলো রেজা। পথ আটকেছে পুলিশের গাড়ি।

ড্রাইভারের জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো পুলিশ অফিসার। বুকে লাগানো নেম ট্যাগ-এ নাম লেখা রয়েছে তার : বারক। তার সহকারীর নাম মিজার। এভাবে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণ জানতে চাইলো অফিসার।

জানালো রেজা।

'ধাক্কা দিয়ে ফেলতে চেয়েছিলো?' ভ্যানের গায়ে গভীর দাগ পরীক্ষা করছে মিজার, সেদিকে তাকিয়ে বললো বারক।

'হ্যাঁ। আরেকটু হলেই মরতাম।'

'লাইসেন্স নম্বর রাখতে পারোনি নিশ্চয়?'

'না,' সুজা জবাব দিলো। 'তবে কাদের লরি, জানি। নিউ জারসির রেপটাইল ল্যাবরেটরি।'

অফিসারের পাশে এসে দাঁড়ালো মিজার। বললো, 'লরিটার দোষ।'

রেডিওতে কথা বলতে শুরু করলো বারক।

ছেলেরা নেমে পড়েছে। দেখছে, কতোটা ক্ষতি হয়েছে ভ্যানের।

রেডিওতে বলা শেষ করে জিজ্ঞেস করলো বারক, 'তোমাদের গাড়ি টেনে নেয়ার দরকার হবে?'

'না,' সুজা বললো। 'বডির ক্ষতি হয়েছে শুধু। এঞ্জিন ঠিক আছে। ভালোই চলছিলো।'

'বেশ। তোমাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স চেক করতে বলেছিলাম বেপোর্টে, ঠিকই আছে। অন্যায় যা করেছো, তাতে অন্তত আধ-ডজন টিকেট পাওনা হয় তোমাদের,' হাসলো বারক। 'তবে ইচ্ছে করে করোনি, বোঝা যাচ্ছে। এবারকার মতো ছেড়ে দেয়া গেল।'

চোয়াল ডললো মিজার। 'সত্যি বলছো, রেপটাইল ল্যাবরেটরির ট্রাক?'

'নাম তো তাই দেখলাম,' বললো সুজা। 'কেন?'

চিন্তিত দেখালো মিজারকে। 'আমাদের ডিসপ্যাচার ওখানেও খোঁজ নিয়েছে। ওদের সমস্ত লরি নাকি কারখানাতেই রয়েছে। অন্য কোনো গাড়ি দেখোনি তো? মানে, এতোসব উত্তেজনা, কুয়াশার মাঝে ভুল দেখা...'

'না, ঠিকই দেখেছি!' দৃঢ়কণ্ঠে বললো সুজা।

শ্রাগ করলো পুলিশ অফিসার। 'ঠিক আছে, আরও ভালো-মতো খোঁজখবর নেবো।' বারকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'চলে যাক, নাকি?'

মাথা নেড়ে সায় জানালো বারক।

অস্বস্তি ফুটেছে আকরামের চোখে। 'খবরটা কাগজে উঠবে না তো?' ভ্যান ছাড়ার পর বললো সে।

'না,' রেজা বললো। 'রিপোর্টার-টিপোর্টার তো কেউ ছিলো না। কে বলবে?...এই দাঁড়াও, দাঁড়াও!'

অবাক হয়ে রেজার দিকে তাকালো অন্য দু'জন।

'জরুরী একটা কথা মনে পড়েনি আমাদের!' রেজা বললো আবার। 'বড় একটা সূত্র।'

'সূত্র?' সুজার প্রশ্ন।

বিষণ্ণ হাসলো রেজা। 'আকরাম, মনে আছে, তুমি বলেছিলে টাইগার স্নেক আনার খবরটা গোপন রাখা হয়েছে। তাহলে রিপোর্টার মরগান খবর পেলো কিভাবে? পুলিশকে ফোন করেছে সিকিউরিটি, রেডিওতে খবর দেয়নি। তাহলে কি করে জানলো মরগান?'

'ঠিক বলেছো!' চেঁচিয়ে উঠলো আকরাম। 'জানার কোনো উপায় ছিলো না, যদি না...'

'...যদি না চিড়িয়াখানার কেউ খবর দিয়ে থাকে!' কথাটা শেষ করে দিলো সুজা।

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'শুধু মরগানকেই খবর দিয়েছে, তা নয়। ওই "কেউটা" চোরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজও করছে।'

'এমনও তো হতে পারে,' তর্কের খাতিরে বললো সুজা, 'সাপটার কথা মুখ ফসকে বাইরের কাউকে বলে ফেলেছে কেউ?'

'না, তা নয়। চোর কমপক্ষে দু'জন। একজন ভেতরের, আরেকজন বাইরের।' সুজার দিকে চেয়ে হাসলো রেজা। 'এটা তুইই

প্রমাণ করেছিস। শ্যাফটে ঢুকে। বাইরে থেকে চোরকে শ্যাফটে ঢোকার উপায় করে দেয়ার জন্যে নিশ্চয় কাউকে না কাউকে ফ্যান বন্ধ করতে হয়েছে। সে ভেতরের লোক। আরও একটা ব্যাপার, রিচারের অফিসে ঢুকতে হলে, একটা জিনিস অবশ্যই দরকার। সেটা ছাড়া অ্যালার্মকে ফাঁকি দিতেই পারবে না…'

'পাস!'

'হ্যাঁ, পাস,' বলতে বলতে পকেট থেকে ব্রোঞ্জ রঙের কার্ডটা বের করলো রেজা।

'দাদা, আরেকটা সূত্র আছে। খেয়াল করিনি আমরা।' আকরামের দিকে তাকালো সুজা, 'তোমার স্ক্রু-ড্রাইভার। কাজ যখন করতে না, ল্যাবরেটরিতেই থাকতো ওটা, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালো আকরাম।

'বেশ,' সুজা বললো, 'তুমি যখন বলছো, তুমি চোর নও, স্ক্রু-ড্রাইভারটাও নিশ্চয় তুমি ভেন্টে নিয়ে গিয়ে রাখোনি। ওখানে তোমার যাওয়ার কথা নয়। আর আপনাআপনি ওটা ওখানে গিয়ে পড়েও থাকেনি।'

'নিশ্চয়ই!' বলে উঠলো রেজা। 'শ্যাফটের মুখের জালি লাগানো থাকে। স্ক্রু-ড্রাইভার ছাড়া কি করে খুলবে? স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়েই খুলেছে, তবে আকরামেরটা দিয়ে নয়। তাহলে ওটা ফেলে গিয়ে বাইরে থেকে আবার জালি লাগাতে পারতো না। ওকে ফাঁসানোর জন্যেই ওটা নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে ভেন্টের মুখের কাছে। আরেকটা কথা…,' থামলো সে। 'ডাক্তার বিগলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রেপটাইল ল্যাবরেটরি থেকে কি কি

কেনে তাঁদের হাসপাতাল। বিষ, অ্যান্টিভেনিন, এসব।'

আকরাম ধরলো কথাটা, 'সাপ থেকে বিষ বের করে, অ্যান্টি-ভেনিন বানায়! তারমানে, বিষধর সাপ কেনে!' তিক্ত হাসি ফুটলো ঠোঁটে। 'এটা আরেকটা সূত্র।'

'বাঁয়ের রাস্তা,' ম্যাপ দেখে বলে উঠলো হঠাৎ সুজা। 'বাঁয়ে যেতে হবে।'

ল্যাবরেটরির ব্যক্তিগত পথ। দু'ধারে কাঁটাতারের বেড়া। গতি কম রেখে গাড়ি চালালো রেজা। পথের শেষ মাথায় পৌঁছে কুয়াশার মধ্যেও চোখে পড়লো ছোট বড় কতগুলো বাড়ির সমষ্টি, আর পার্কিং লটে, লোডিং বে-তে নানারকম গাড়ি। প্রধান ফটকের ওপরে বড় করে লেখা: রেপটাইল ল্যাবরেটরি অ্যাণ্ড মেডিক্যাল সাপ্লাই কোম্পানি। একটা অফিস বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই আগুনরঙা পিলারি।

'দাদা, দেখেছো?'

'দেখেছি। ওটার মালিকের সঙ্গে কথা বলার সময় এসেছে।'

ল্যাবরেটরির সীমানার বাইরে একধারে গাড়ি থামালো রেজা। ফুটখানেক দূরে কাঁটাতারের বেড়া, সীমানা ঘিরে রাখা হয়েছে। 'বললে তো অনুমতি দেবে না, চুরি করেই ঢুকতে হবে।'

হাসি ফুটলো আকরামের ঠোঁটে। 'এমনিতেই তো চোর সন্দেহ করা হচ্ছে আমাকে। এখানে ধরা পড়লে কি জবাব দেবো?' জবাবের অপেক্ষা করলো না সে। রেজা আর সুজার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ভ্যানের ছাতে। তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপাশে নামলো তিনজনে। কুয়াশার ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে ফিরে

তাকালো একবার সুজা। তারপর আবার এগোলো। 'ঢুকলাম তো সহজেই,' বললো সে। 'কিন্তু বেড়া ডিঙিয়ে আবার ভ্যানের ছাতে চড়া কঠিন হবে।'

ল্যাবরেটরির পেছনে এসে দাঁড়ালো ওরা। নানারকম যন্ত্রপাতির বিচিত্র শব্দ আসছে ভেতর থেকে। পেছনের যে কয়টা দরজা দেখলো, কোনোটাই খোলা পেলো না। সাবধানে বাড়িটার এককোণে গিয়ে ওপাশে উঁকি দিলো সুজা। জানালো, 'একসারি ট্রাক। আর দুটো লোডিং বে। খালি। ওখান দিয়ে ঢোকা যাবে মনে হয়।'

'দেখবে না কেউ?' আকরামের প্রশ্ন।

'দেখতেও পারে,' রেজা বললো। 'তবে আমরা এখানকারই লোক ভাববে হয়তো। অনেক বড় কারখানা। সবাই সবাইকে চেনে বলে মনে না।'

'চলো, ঢুকে পড়ি,' বলেই হাঁটতে শুরু করলো সুজা। চলে এলো আরেক কোণে। ওপাশে বেরোতেই একটা লোকের প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়লো। লোকটা মোটা, গাঢ় রঙের জ্যাকেট পরা।

'এই যে, ছেলে!' ধমক দিলো সে। 'দেখে চলতে পারো না?' চোখে সন্দেহ। দেখলো তিনজনকে। 'এখানে কি করছো? পাস কই? সমস্ত অ্যালার্ম চালু করে দেবে তো!'

পকেট থেকে চিড়িয়াখানার পাসটা বের করলো রেজা। আশা করছে, আকরামেরটা চেয়ে বসবে না সিকিউরিটি গার্ড, ওরটা নিয়ে গেছে পুলিশ।

সুজা বের করলো ওরটা।

রেজাকে অবাক করে দিয়ে আকরামও পকেট থেকে কার্ড বের করলো, হাসলো বোকাটে হাসি।

ভ্রূকুটি করলো মোটা লোকটা।

'টিফিনের তো এখনও বিশ মিনিট বাকি,' বললো সে। 'ঠিক আছে, এবার ছেড়ে দিলাম। জলদি কাজে যাও। আরেকবার ধরতে পারলে সোজা বসের কাছে নিয়ে যাবো।'

'ইয়েস, স্যার,' বোকা বোকা কণ্ঠে বললো সুজা। দ্রুত রওনা হয়ে গেল লোডিং এরিয়ার দিকে। পেছনে রেজা আর আকরাম।

খানিকদূর এগিয়ে দল ছাড়া হয়ে পড়লো রেজা। মোড় নিয়ে এগোলো আগুনরঙা গাড়িটার দিকে। ওটার চারপাশে এক চক্কর ঘুরে, কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখলো, তারপর তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এলো অন্য দু'জনের কাছে। ডকে উঠে পড়লো তিনজনে। নির্দ্বিধায় ঢুকে গেল ওয়্যারহাউসের ভেতরে।

অসংখ্য বাক্স ওখানে। সবাই কাজে ব্যস্ত। অপেক্ষমাণ ট্রাকে তোলা হচ্ছে ওসব বাক্স। আগে আগে চলছে সুজা। নির্জন একটা কোণে কতগুলো বাক্সের স্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

'আকরাম,' আড়ালে এসে জিজ্ঞেস করলো রেজা, 'ইলেকট্রনিকসের জিনিয়াস তুমি, জানি। কিন্তু ওই কার্ড দেখালো কি করে? ম্যাজিক?'

হেসে আবার কার্ডটা বের করলো আকরাম। নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, 'প্ল্যাস্টিকের যুগে বাস করছি আমরা, বন্ধুগণ। সবখানেই

প্ল্যাস্টিকের ছড়াছড়ি। এই নাও, দেখো।'

দেখলো রেজা আর সুজা। বেপোর্ট লাইব্রেরির কার্ড ওটা।

সুজা বললো, 'দাদা, কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে আমাদের। পল নিউম্যান বললো, একটা টাইগার স্নেক থেকে হপ্তায় এক আউন্স করে বিষ বের করা যায়। কিন্তু যে হারে বাক্স বোঝাই করতে দেখলাম, ওগুলো ভরতে অনেক শিশি দরকার। আর ওই শিশি ভরতে কতো বিষ দরকার? কতগুলো সাপ লাগবে? কোথায় সাপগুলো?'

পকেট থেকে একটা রশিদ বের করলো রেজা। তাতে একজায়গায় বিজ্ঞাপন রয়েছে: ইওর কমপ্লিট মেডিক্যাল সোর্স। সেটা দেখিয়ে বললো, 'বিষ ছাড়াও অনেক জিনিস সাপ্লাই দেয় ওরা। হাসপাতালে অনেক ওষুধ আর কেমিক্যাল লাগে। নিশ্চয় বিষ বের করার আলাদা ল্যাবরেটরি আছে। ওটা খুঁজে বের করতে হবে।'

'এটা তো গুদাম। ল্যাবরেটরি কোনটা?' নিজেকেই প্রশ্ন করলো আকরাম।

বাইরে বেরোলো ওরা। বেরিয়েই আবার পড়লো সেই মোটা গার্ডের সামনে।

'তোমরা? কি ব্যাপার, এরকম ঘুরঘুর করছো কেন? কে তোমরা?' তীক্ষ্ণ চোখে তিনজনের আপাদমস্তক দেখলো লোকটা। 'এখানে আর দেখেছি বলে তো মনে হয় না। কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করো? এখানে কি?' জবাব না পেয়ে সন্দেহ আরও বাড়লো তার। 'চলো, বসের কাছে চলো।'

সুজার পাশ কাটিয়ে লোকটার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো রেজা।

'মিস্টার মরগানের কাজ করি আমরা,' জোরগলায় বললো সে। 'তোমার ব্যবহার ভালো নয়, জানাবো তাকে। বার বার আমাদের কাজে বাধা দিয়েছো শুনলে…'

চোখে ভয় দেখা দিলো লোকটার। 'এই এই, শোনো, আমি জানতাম না। আমি ভেবেছি…যাকগে, কিছু মনে করো না। আসলে আমি আমার দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমি…'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাত তুললো সুজা। 'মিস্টার মরগান এখন কোথায়, জানেন? রিপোর্ট করতে হবে তাঁর কাছে।'

'নিশ্চয়,' মোমের মতো গলে গেছে কঠোর সিকিউরিটি গার্ড। 'কয়েক মিনিট আগে দেখলাম এলিভেটরে করে ল্যাবরেটরিতে গেলেন। ওখানেই পাবে।'

'দেখুন, এখন আর আপনাকে বলতে অসুবিধে নেই, আমরা এখানে নতুন কাজ করছি। কোনদিকে যদি দেখিয়ে দেন…'

'ওই যে, ওদিকে। এই গলির শেষ মাথায়।'

ঘড়ি দেখলো আকরাম। 'ও, আপনার টিফিনের সময় হলো বোধহয়।' তার কথা শেষ হতে না হতেই সাইরেন বেজে উঠলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থেমে যেতে শুরু করলো কারখানার এঞ্জিনের শব্দ। কাজ থামিয়ে দিলো কর্মীরা।

হাঁপ ছাড়লো গার্ড। 'হ্যাঁ, সময় হলো। যাই। থ্যাংকস।' তাড়াহুড়ো করে চলে গেল সে, পালিয়ে বাঁচলো যেন।

ছেলেদের সামনে, নিচে একটা দরজা খুলে গেল, হাঁ হয়ে গেল যেন কারগো এলিভেটরের মুখ।

'চলো, চলো, এইই সুযোগ,' আকরাম বললো। দ্রুত এগোলো

বারান্দা ধরে। 'মরগানের নাম হঠাৎ মনে এলো কেন তোমার, রেজা?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো সে।

'পিলারিটাকে তখন দেখতে গিয়েছিলাম, মনে আছে? গ্লোভ কম্পার্টমেন্টেই রয়েছে গাড়ির ব্লু বুক। তাতে মরগানের নাম। বাকিটা আন্দাজ করে নিলাম। সে-ই এখানকার বস।'

'ধরা পড়লে মরেছি!' সুজা বললো। 'দারোয়ান ব্যাটাকে তো কোনোমতে ফাঁকি দিলাম···।' বাকি কথাটা শেষ করলো না সে।

এলিভেটরের সামনে চওড়া প্ল্যাটফর্মে উঠলো ওরা। সাধারণত মাল ওঠানো-নামানোর কাজে ব্যবহার হয় ভারি এই এলিভেটরটা।

'আরও সাবধানে থাকতে হবে,' রেজা বললো। 'নিচে নেমে আর কারও সামনে পড়া চলবে না। গুদামের গার্ডকে ধোঁকা দিতে পেরেছি বটে, আমার মনে হয় না ল্যাবরেটরিরগুলো এতো বোকা হবে। এলিভেটর ছাড়া নামতে পারলে ভালো হয়।'

পথ খুঁজতে লাগলো ওরা। খানিক পরে আকরাম ডাকলো। ওর কাছে গিয়ে রেজা আর সুজাও দেখলো, প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় মেঝেতে ছোট একটা ট্র্যাপডোর। তাতে আঙটা লাগানো, ঢাকনাটা টেনে তোলার জন্যে। আকরাম বললো, 'ইনসপেকশন শ্যাফট। এলিভেটর খারাপ হলে কোথায় কি হয়েছে দেখার জন্যে এটা দিয়ে নামে।'

আঙটা ধরে টেনে ঢাকনাটা তুলে ফেললো আকরাম। গর্তে নামলো তিনজনে। কংক্রিটের দেয়ালে একটু পর পরই লোহার আঙটা লাগানো রয়েছে, ধরে নামা-ওঠার জন্যে। কুয়ার তলায় নেমে পেয়ে গেল দরজা।

তেরো

সাবধানে পাল্লা ঠেলে উঁকি দিলো সুজা। 'কাউকে দেখছি না।' ফিসফিসিয়ে বললো সে। 'নিশ্চয় খেতে চলে গেছে। কিংবা বিশ্রাম নিচ্ছে।'

লম্বা, ঝকঝকে পরিষ্কার একটা বারান্দায় বেরিয়ে এলো ওরা।

আকরাম বললো, 'ল্যাবরেটরিটা আশেপাশেই আছে।'

শেষ মাথায় আরেকটা দরজা। ঠেলে খুলে ভেতরে ঢুকলো ওরা। কংক্রিটের দেয়াল। কোমর সমান উঁচুতে জানালা, কাচ লাগানো। জানালার ভেতর দিয়ে ল্যাবরেটরি চোখে পড়লো। লোকেরা সিগারেট খাচ্ছে কেউ, কেউ কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, কেউ বা পায়চারি করছে, কেউ কেউ আবার গোল হয়ে বসে জটলা করছে।

'টিফিন আওয়ার শেষ হওয়ার আগেই লুকানোর জায়গা বের করতে হবে আমাদের,' রেজা বললো।

করিডর ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা জানালার নিচে বসে পড়লো ওরা।

ইঙ্গিতে একটা পরিচিত যন্ত্র দেখালো সুজা। স্লট। দরজার নবের পাশে দেয়ালে ওটার ফোকর। বেপোর্টের চিড়িয়াখানার মতোই সিকিউরিটি সিসটেম এখানেও। স্লট লাগানো ঘরগুলোয় ঢুকতে চাইলে পাস দরকার হবে।

'তালা নেই, এমন একটা ঘর খুঁজে বের করতে হবে।' ঘড়ি দেখলো রেজা। 'সময় বেশি নেই। এসো।'

করিডরের আরেক মাথার দিকে এগোলো ওরা। ডানে মোড় নিয়ে চলে গেছে সুড়ঙ্গের মতো আরেকটা করিডর।

কোণের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে সাইরেন শোনা গেল। খুলে যেতে আরম্ভ করলো দরজা। লোকের কণ্ঠ কানে এলো। পেছনে একটা দরজা খোলার শব্দ হতেই ঝট করে বসে পড়লো ওরা। কিন্তু ওদের দিকে তাকালো না লোকটা। ধীরে ধীরে সরে গেল পায়ের আওয়াজ।

'ইস্, বাঁচলাম!' নিঃশ্বাস ফেলতে যেন ভয় পাচ্ছে সুজা।

'এভাবে ঘোরা উচিত হচ্ছে না,' রেজা বললো। 'ধরা পড়ে যাবো। ওই যে, একটা দরজা। চলো, দেখি।'

পায়ে পায়ে দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালো ওরা। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো আকরাম। ইশারায় ডাকলো অন্য দু'জনকে।

ঘরের দেয়াল ঘেঁষে রাখা রাশি রাশি কাচের বাক্স। একজন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাক্সের সামনে। কিছু করছে। যখন ঘুরলো, দেখা গেল তার হাতে ধরা একটা সাপ কিলবিল করছে। কাচের দেয়ালও সাপটার লেজের রাগতঃ খটখট শব্দ পুরোপুরি ঠেকাতে পারলো

না।

'টিমবার র‍্যাটেলার!' ফিসফিস করে জানালো আকরাম। 'ওই সাপ আরও দেখেছি আমি।'

সাপটাকে পরীক্ষা করলো লোকটা। তারপর আবার খাঁচায় ভরে রাখলো। আরেক খাঁচা থেকে বের করলো আরেকটা সাপ।

'ডায়মণ্ডব্যাক!' বিড়বিড় করলো আকরাম।

অবাক হয়ে গেছে ছেলেরা।

সাপটাকে টেবিলের কাছে নিয়ে গেল টেকনিশিয়ান। মাথার পেছনে শক্ত করে চেপে ধরে হাঁ করা মুখের শ্বদন্ত দুটো ঢুকিয়ে দিলো একটা জারের মুখে বাঁধা রবারের চাদরে। হলদেটে তরল বিষ ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগলো কাচের জারে।

'দুধ দোয়াচ্ছে!' সুজা বললো।

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। চিড়িয়াখানা থেকে র‍্যাটল স্নেক চুরি যায়নি। গিয়েছে গোখরো। তাছাড়া জেনেই এসেছি আমরা, রেপটাইল ল্যাবরেটরি সাপের বিষ বিক্রি করে।'

কাজ শেষ করে সাপটাকে এনে আবার খাঁচায় ভরলো টেকনিশিয়ান। তারপর টেবিল থেকে জারটা তুলে নিয়ে ওপাশের একটা দরজা খুলে চলে গেল আরেক ঘরে।

'এসো,' রেজা বললো, 'এইই সুযোগ। দেখি কি কি সাপ আছে।'

দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকলো ওরা। খুঁজতে শুরু করলো।

'দেখো, কি পেয়েছি ?' খানিক পরে বললো আকরাম। হাতে একপাতা কাগজ।

'কী ?'

'মালের ফরমাশ।'

'ভাঁজ দেখেছো!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো সুজা।

'হ্যাঁ, সেটাই দেখাতে চাইছি,' আকরাম বললো। 'দেখে যাও, সই কার!'

রেজা আর সুজাও পড়তে পারলো জেমস ককের নাম। স্পষ্ট স্বাক্ষর।

'রেপটাইল ল্যাবরেটরি থেকে মাল চায় কেন কক?' আকরামের প্রশ্ন। 'সে কাজ করে চিড়িয়াখানায়।'

জ্বলজ্বল করছে রেজার চোখ। 'বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি। ওরকম ভাঁজ আগেও দেখেছি আমরা, তাই না? মনে আছে, পল নিউম্যানের হাতে একটা কাগজ দিয়েছিলো কক। ক'টা সাপ হারিয়েছে, তার লিস্ট। ওটাও এরকম ভাঁজ করা ছিলো। তারপর, ফুটবল খেলার সেই টিকেটটা।' আকরামের হাতের কাগজটায় টোকা দিলো সে। 'আমার বিশ্বাস...'

'কে জানি আসছে!' জরুরী কণ্ঠে বললো আকরাম।

দ্রুত আবার করিডরে ফিরে এলো ছেলেরা। জানালার নিচে বসে মাথা বাড়িয়ে উঁকি দিলো ঘরের ভেতর। সেই টেকনিশিয়ান ফিরে এসেছে।

'এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে,' ফিসফিস করে বললো রেজা, 'এখানকার লোকেই চিড়িয়াখানার সাপ চুরি করেছে।

করে থাকলে নিশ্চয় এখানেই আছে সাপগুলো। কোথায় খুঁজবো?' আনমনে মাথা নাড়লো সে।

হঠাৎ শোনা গেল পদশব্দ। এগিয়ে আসছে। কথাও শোনা যাচ্ছে।

উঠে গিয়ে এক এক করে দরজা পরীক্ষা করতে শুরু করলো তিনজনে। নব ধরে ঠেলে ঠেলে দেখছে। পাগল হয়ে উঠেছে যেন। ইস্, মাত্র একটা···যে-কোনো একটা দরজা যদি খোলা যেতো! অবশেষে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলো আকরাম, 'খোলা! জলদি এসো!'

ওরাও ঢুকলো, পায়ের শব্দও এসে থামলো ওরা যে করিডরে ছিলো এতোক্ষণ, সেটাতে।

তারপর শোনা গেল দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ।

'যাক, ঢুকেছে,' হাঁপ ছাড়লো সুজা। 'আরেকটু হলেই ধরা পড়েছিলাম।'

আরেকটা দরজা দেখালো রেজা, স্লটের ফোকরের ওপর প্ল্যাস্টিকের আচ্ছাদন। 'ওরকম কেন? কার্ড ঢোকাবে কি করে?'

জবাব দিতে পারলো না কেউ।

ঘরের ঠিক মাঝখানে ইস্পাতের ভারি একটা ল্যাবরেটরি টেবিল। এক কোণে লম্বা একটা বেঞ্চে রাখা কতগুলো বেল জার। জানালা নেই। তবে দ্বিতীয় দরজাটার পাশে দেয়ালের অনেকখানি জায়গা কেটে সেখানে খুব শক্ত কাচ লাগানো হয়েছে। অন্য পাশে পর্দা লাগানো, ফলে তার ওপাশে কি আছে দেখা যায় না।

পায়চারি করছে আকরাম। আনমনে বিড়বিড় করলো, 'ঘরটা কেমন চেনা চেনা লাগছে!...এরকম কেন? কি...'

হঠাৎ খট করে আওয়াজ হলো দরজায়, যেটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা। ঠেলা দিয়ে দেখলো সুজা। 'আরি! খোলে না তো! ব্যাপারটা কি?'

মুহূর্ত পরেই জবাব মিললো। বিশাল পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো একটা মুখ। হেনরি মরগান!

'বাহ্, চমৎকার!' শুকনো কণ্ঠে বললো সে, কথা শোনা গেল দেয়ালে বসানো গোপন স্পীকার থেকে। 'সবাই বলে, রিপোর্টারদেরই নাকি শুধু আড়িপাতা স্বভাব। এখন দেখছি রোগটা সংক্রামক।'

'মরগান,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে রেজা, 'আপনার জারিজুরি শেষ, খেল খতম। আমরা জেনে গেছি, আপনি আর আপনার এক সহকারী মিলে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন আকরাম খানকে। চোরাই বিষ বিক্রি করছেন রেপটাইল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে।'

'বাহ্, বেশ চালাক তো। তবে তোমরাও কল্পনা করতে পারবে না আমার সহকারীটি কে।'

'জেমস কক।'

হাঁ হয়ে গেল রিপোর্টার। হাসি মুছে গেল। সামলে নিতে সময় লাগলো তার। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো ছেলেদের দিকে।

'ও ছাড়া আর কেউ না,' রেজা বলতে লাগলো। 'টাইগার শেকের আড্ডার খবর চিড়িয়াখানার বাইরের কারো জানার কথা

নয়। ভেনটিলেশন ফ্যান বন্ধ করে দিয়ে তার পক্ষেই শ্যাফট দিয়ে বেরোনো সহজ। তাছাড়া বিষাক্ত সাপ চুরি করেছে।' মরগানের পেছনে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একসারি কাচের বাক্সের দিকে হাত তুললো সে। 'আনাড়ি লোক ওসব ঘাঁটতে সাহস করবে না। আমার বিশ্বাস, পুলিশ খোঁজ নিলেই জেনে যাবে, একটা বদ-অভ্যাস আছে ককের। কাগজ হাতে থাকলেই ভাঁজ করতে শুরু করে। বাতিল কাগজ ফেলার আগে ভাঁজ করে, তারপর দলে-মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে।'

ক্ষণিকের জন্যে ভয় দেখা দিলো রিপোর্টারের চোখের তারায়। 'বলে ভুল করলে। আর কিছু করার নেই এখন আমার। দুর্ঘটনায় পড়তে হবে তোমাদের।'

'হাসপাতালে যেরকম চেষ্টা করেছো?' দাঁতে দাঁত চাপলো আকরাম।

আরেকবার অবাক হবার পালা মরগানের। 'যাক, সব তাহলে জানো না। ওই লোকটা আমি ছিলাম না। ও আমার আরেক সহকারী। ককের মতো ওটাও আরেক গাধা। সেদিন চিড়িয়া-খানায় সাপ চুরি করার সময়ও গণ্ডগোল করে ফেলেছিলো। ওর সঙ্গে আরও লোক ছিলো অবশ্য। তারপরেও ঠিকঠাক মতো পারেনি। হাত থেকে সাপের বাক্স ফেলে দিয়েছিলো। ডালা খুলে সাপ ছুটে গেছে।' আকরামের দিকে চেয়ে চোখ সরু হয়ে এলো তার। 'চালাকই বলতে হবে তোমাদেরকে। পাস ছাড়া এতোদূর চলে এসেছো। কিন্তু করিডরের ছাতে যে টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ রয়েছে, খেয়াল করোনি। রেপোর্ট চিড়িয়াখানার

মতোই সিকিউরিটি সিসটেম চালু করেছি আমরা এখানে।'

'আমরা যে আসছি, সে তো জানতেনই,' সুজা বললো। 'আগেই ব্যবস্থা নেননি কেন?'

'জানি?'

'জানেন না? ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলো আরেকটু হলেই। আপনাদেরই তো লরি।'

'তাই নাকি? তাহলে ওটা নিছক দুর্ঘটনা। কুয়াশার জন্যে দেখেনি আরকি ড্রাইভার।' মৃদু হাসি ফুটলো মরগানের ঠোঁটে। 'তবে অসুবিধে নেই। কিছুক্ষণ বেশি বাঁচলে, এই যা। কথা দিচ্ছি, করুণ এই দুর্ঘটনার খবর খুব ফেনিয়ে, রসিয়ে লিখবো আমি। পাঠকরা কেঁদে ফেলবে।'

'কি বলছেন?' বুঝতে পারলো না সুজা।

'ক্লিন-রুম!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো আকরাম। 'সেজন্যেই তখন ঘরটা চেনা চেনা লাগছিলো। চিড়িয়াখানার মতো একই-রকম। এসব করে পার পাবে না তুমি, শয়তান! খুনের অপরাধে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

মরগানের হাসি মুছলো না। 'আমার তা মনে হয় না। তুমিই বাঁচিয়ে দেবে। তোমার ক্রিমিন্যাল রেকর্ড আছে। দুর্ঘটনার পর পুলিশ এসে ধরেই নেবে, দুই সঙ্গীকে নিয়ে এখানেও সাপ চুরি করতে এসেছো। আহ্, তিন সাপ চোরের কাহিনী লিখতে কি যে মজা লাগবে না!' হেসে উঠে পর্দা টেনে দিয়ে চলে গেল সে।

'কি বললো ও, আকরাম?' জিজ্ঞেস করলো সুজা। 'কি ঘটতে যাচ্ছে?'

পাগলের মতো ঘরের চারপাশে তাকাচ্ছে আকরাম। 'এটা ক্লিন-রুম। স্টেরিলাইজড করার দুটো উপায়, আলট্রাভায়োলেট রে দিয়ে, কিংবা পানি ছেড়ে দিয়ে।' ওর কথা শেষ হতে না হতেই তোড়ে পানি পড়ার শব্দ শোনা গেল। দেয়ালে লাগানো ছয় ইঞ্চি মোটা মোটা পাইপ দিয়ে পানি বেরোচ্ছে। 'ভাসিয়ে দেবে সমস্ত ঘর···!' বললো সে।

'ভাসিয়ে দেবে?' রেজা বললো। ইতিমধ্যেই পায়ের গোড়ালি ঘিরে নাচতে আরম্ভ করেছে পানি। 'ছাত পর্যন্ত উঠবে নাকি?'

মাথা ঝাঁকালো আকরাম। 'তারপর পাম্পের সাহায্যে আবার টেনে নেবে। আমাদের ডুবিয়ে মারার ব্যবস্থা করেছে মরগান!' এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে। বেরোনোর উপায় খুঁজছে।

দ্রুত উঠছে পানি। পাঁচ মিনিটেই হাঁটুর কাছে। দশ মিনিট পর ল্যাবরেটরি টেবিলটার কিনারা ছুঁলো।

'দাদা, কিছু একটা করা দরকার!' চেঁচিয়ে বললো সুজা। জোরে জোরে ধাক্কা মারছে বন্ধ দরজায়, কাঁধের ধাক্কায় ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে।

পেরিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। রেজাও বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করছে। পানি গলার কাছে উঠে এসেছে, এই সময় বলে উঠলো সে, 'বেল জার!' বলেই সাঁতার কেটে ছুটলো সেদিকে।

আকরাম আর সুজাও পিছু নিলো।

একটা জার তুলে নিয়ে দেখালো রেজা। 'হেলমেটের মতো করে মাথার ওপর বসিয়ে দেবে। এভাবে।' বসালো সে। 'ভেতরে বাতাস আটকে থাকবে, তাতে কিছুক্ষণ হলেও দম নেয়া যাবে।

জলদি তুলে নিয়ে চলে যাও টেবিলের কাছে।'

টেবিলে উঠে দাঁড়ালো তিনজনে। নিচু ছাত, মাথায় লাগে। বুকের কাছে যখন পানি উঠে এলো, জারটা উপুড় করে ধরলো রেজা। 'এভাবে বাতাস ঢুকিয়ে নাও।'

'এই বাতাসে আর কতোক্ষণ!' আকরাম বললো।

'যতোক্ষণ বাঁচা যায়, ততোক্ষণই লাভ···।'

'এইই,' চেঁচিয়ে উঠলো সুজা, 'মরগান না বলে গেল চিড়িয়াখানার মতোই সিকিউরিটি সিসটেম এখানেও?'

মাথা ঝোঁকালো আকরাম। 'হ্যাঁ। তাতে কি? তোমাদের সিকিউরিটি পাস এখানে কাজ করবে না।'

'কি জানি!' রেজাও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। 'সিসটেম প্রোগ্রামিঙে অনেক খরচ। এতো খরচ কেন করতে যাবে মরগান? সহজেই চিড়িয়াখানার কোড কাজে লাগাতে পারে।' পকেট থেকে কার্ডটা বের করলো সে। 'ধরো,' জারটা বাড়িয়ে দিলো সে।

লম্বা দম নিয়ে পানিতে ডুব দিলো রেজা। সাঁতরে চলে গেল দরজার কাছে। পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে পানি, অস্থির, চঞ্চল; দরজা ভালোমতো চোখে পড়ে না। প্ল্যাস্টিক লাগানো রয়েছে স্লটের ওপর। কিছুটা দেখে, কিছুটা অনুমানে ওই ফোকরে কার্ড ঢোকানোর চেষ্টা করতে লাগলো সে।

কিন্তু পারছে না। পানির চাপের জন্যে স্লটের ওপরের প্ল্যাস্টিক তোলাই সম্ভব হচ্ছে না। দম ফুরিয়ে এসেছে। বাতাসের জন্যে আকুলি বিকুলি করছে ফুসফুস। সাঁতরে ফিরে এলো আবার

টেবিলের কাছে।

মূল্যবান বাতাস ভর্তি জারটা উঁচু করে ধরে রেখেছে সুজা। গলার কাছে পৌঁছে গেছে পানি। সময় আর বেশিক্ষণ নেই।

'হলো না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো রেজা। 'প্ল্যাস্টিকই খুলতে পারলাম না।' কার্ডটা তুলে দেখালো। ঢোকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। বেঁকে, ছিঁড়ে গেছে।

জারের মধ্যে মাথা ঢোকাতে বাধ্য হলো ওরা। অক্সিজেন ফুরাতে সময় লাগবে না। এই সময়ের মধ্যে কিছু করতে না পারলে জিতে গেল মরগান। ওদের তিনটে লাশ পাওয়া যাবে। চুরি করে ক্লিন-রুমে ঢুকেছে ওরা, প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না তার। ক্লিন-রুমে পানি ছাড়ার আগে মানুষ আছে কিনা দেখার দরকার মনে করেনি টেকনিশিয়ান, পুলিশকে একথাই বলবে, কারণ, স্টেরিলাইজড করার আগে নোটিশ দিয়ে দেয়া হয়। তারপর ল্যাবরেটরির কেউ আর ওখানে থাকে না।

নিজের পাসটা বের করলো সুজা। আরেক পকেট থেকে ছুরি। শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখবে। লম্বা শ্বাস টেনে জারের ভেতরের প্রায় সমস্ত বাতাসটুকু ফুসফুসে টেনে নিলো সে। তার-পর ডুব দিলো।

জারের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে রেজা আর আকরাম। দেখছে, হাত-পা নেড়ে দরজার কাছে চলে যাচ্ছে সুজা।

কি করছে সুজা, দেখতে পাচ্ছে না ওরা। তবে ওর পা নাড়া-নো দেখেই বুঝতে পারছে, কিছু একটা নিয়ে জোরাজুরি করছে

সে। তাতে ফুসফুসের অক্সিজেন আরও তাড়াতাড়ি ফুরাবে।

স্লটের ফোকরে ছুরি ঢোকানোর চেষ্টা করছে সুজা। শক্ত প্ল্যাস্টিক। কাটতেই চায় না। অবশেষে, দম যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এই সময় কাটলো প্ল্যাস্টিক। ছুরি দিয়ে টান মেরে প্ল্যাস্টিকের ওপর থেকে নিচে কেটে লম্বা ফাঁক করে ফেললো সে। মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কার্ড ঢুকিয়ে দিলো ভেতরে। কাজ হলে ভালো, নাহলে সব চেষ্টার ইতি এখানেই।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত কিছুই ঘটলো না। তারপর ঝিলিক দিয়ে উঠলো তীব্র নীল শিখা। ধাক্কা দিয়ে যেন দরজার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো সুজাকে। তারপর আবার হ্যাঁচকা টান দিয়ে টেনে নিলো পানির প্রচণ্ড স্রোত। খোলা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে বেরোতে শুরু করেছে পানি।

আতংকিত হয়ে রেজা আর আকরাম দেখলো, সুজার দেহটা ভেসে যাচ্ছে। নড়ছে না সে। যেন লাশ হয়ে গেছে।

'আকরাম!' চিৎকার করে উঠলো রেজা। 'ও ইলেকট্রিক শক খেয়েছে!'

চৌদ্দ

পানির ভেতর দিয়ে পাগলের মতো সাঁতরে এলো আকরাম আর রেজা।

উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে সুজা। টেনে তাকে ল্যাব-রেটরি টেবিলে এনে তুললো দু'জনে মিলে।

কেশে উঠলো সুজা। আস্তে চোখ মেললো। ঘোলাটে দৃষ্টি। ধীরে ধীরে আলো ফুটলো চোখের তারায়। আরেকবার কেশে উঠে দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ঘটেছে?'

'এখনও জানি না,' রেজা বললো। 'হয় পাসটা কাজ করেছে, নয়তো শর্ট-সার্কিট করে দিয়েছে। যা-ই করে থাকুক, আপাতত আমরা বাঁচলাম। তোর কি অবস্থা? কেমন লাগছে?'

'জিভটা মনে হয় তামা হয়ে গেছে। তাছাড়া ভালোই···মর-গানটা কোথায়?' উঠে বসার চেষ্টা করলো সুজা। 'আমাদের-কে···'

জোর করে আবার তাকে শুইয়ে দিলো রেজা। 'শুয়ে থাক, শুয়ে থাক। উঠিস না, বাকিটা আমি আর আকরামই সামলাতে

পারবো।'

'তাড়াতাড়ি করতে হবে!' আকরাম বললো। 'পালানো দরকার।'

ওপাশের ঘরের যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলো মরগান, সেটা ফাঁক হয়ে আছে। ওটার কাছে এসে অন্যপাশে তাকিয়ে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলো আকরাম আর সুজা। কাত হয়ে আছে টেবিল, ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ধাতব ট্রে। হাঁটু পানি ঘরে। আরও ঢুকছে। শর্ট-সার্কিটের কারণে সিলিঙের স্প্রিঙ্কলার সিসটেম অন হয়ে গেছে, অনবরত ঝরে পড়ছে পানি।

ক্লিন-রুমের পানির ধাক্কায় যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে আগেই। জিনিসপত্র তো উল্টে পড়েছেই, সাপের খাঁচাও পড়েছে। কোনোটা ভেঙেছে, কোনোটার ডালা খুলেছে। যেখানে সেখানে সাঁতরে বেড়াচ্ছে, কিলবিল করছে সাপ। এরকম দুর্ঘটনার জন্যে তৈরি ছিলো না ল্যাবরেটরিতে যারা রয়েছে, তারা। কেউ আহত, কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে পানিতে। দু'জন লোক গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘরের এক কোণে, সরতে পারছে না। সাংঘাতিক বিষধর বিশাল এক গোখরো ফণা মেলে রয়েছে ওদের সামনে। নড়লেই ছোবল মারবে।

আকরাম আর সুজাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো একজন। ধরার জন্যে দৌড়ে এলো চারজন শক্তিশালী লোক।

'ধরো, ধরো ওদের!' আবার চেঁচিয়ে আদেশ দিলো প্রথম লোকটা।

লাফ দিলো রেজা। নিজেকে ছুঁড়ে মারলো যেন লোকগুলোর

ওপর। ভারি শরীরটা ধরে রাখতে পারলো না ওরা, পা পিছলে গেল। রেজাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'জন, পানিতে। অন্য দু'জনের সঙ্গে লড়াই শুরু করলো আকরাম।

চারজনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো আরও দু'জন।

ইতিমধ্যে টেবিল থেকে উঠে এসেছে সুজা। চোখ টকটকে লাল। খুব দুর্বল, ওর টলায়মান অবস্থা দেখেই আন্দাজ করা যায়।

অন্যান্য ঘর থেকে ছুটাছুটি করে এলো আরও লোক। দেখতে দেখতে কাবু করে ফেললো তিনজনকে। শক্ত করে চেপে ধরলো।

হঠাৎ গোলমাল ছাপিয়ে শোনা গেল একটা ভারি কণ্ঠ, 'এই, কি হচ্ছে কি এখানে?'

পুলিশ অফিসার। তার আশপাশ দিয়ে ছুটে ঢুকলো দমকল বাহিনীর লোকেরা।

'থামো! থামো সবাই!' আবার ধমক দিলো অফিসার।

চুপ হয়ে গেল ল্যাবরেটরির লোকেরা। ছেড়ে দিলো তিন বন্দিকে। গোখরোটাকে ধরে সরিয়ে আনলো গিয়ে এক টেকনিশিয়ান, দু'জন লোককে ঘরের কোণে আটকে রেখেছিলো যেটা।

এগিয়ে এলো রেজা। সেই পুলিশ অফিসার, বারক, বেপরোয়া গাড়ি চালানোর দায়ে ওদেরকে আটকেছিলো যে। বললো, 'আপনি এখানে এলেন কিভাবে? একেবারে ঠিক সময়ে?'

'সিকিউরিটি সিসটেমে শর্ট-সার্কিট হলেই আপনাআপনি খবর চলে যায় পুলিশ স্টেশন আর ফায়ার স্টেশনে,' জানালো অফিসার। 'লাইন রাখা হয়েছে। অ্যালার্ম বেজে উঠতেই ছুটে চলে এসেছি। ওয়্যারহাউসেই সাধারণত বেশি দুর্ঘটনা ঘটে, প্রথমে

ওখানেই গিয়েছিলাম। তারপর সন্দেহ করলাম নিচে কিছু হয়েছে।' ভুরু কোঁচকালো বারক। 'তোমরা এখানে কি করছো?'

সংক্ষেপে সব জানালো ছেলেরা।

'নিঃসন্তান চাচার কাছ থেকে ল্যাবরেটরিটা পেয়েছে মরগান,' বারক বললো। 'তারপর থেকেই লস দিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটা। তাছাড়া বেহিসেবী খরচ করে সে। নিশ্চয় অনেক ধার করে ফেলেছে। আর কোনো উপায় না দেখে এখন সাপ আর বিষ চুরি শুরু করেছে।'

'রিপোর্টিং কি আগে থেকেই করতো?' সুজা জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ। সেই কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। ল্যাবরেটরির ভার ছেড়ে দিয়েছে ম্যানেজারের ওপর। ওটা আরেক চোর। সন্দেহ করছি অনেক দিন থেকেই, প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছিলাম না। যাক, এখন বোধহয় পারবো,' হাসলো অফিসার। 'আমার কাজ সহজ করে দিলে। চলো, ওপরে চলো।'

পুলিশ ঘিরে ফেলেছে সমস্ত এলাকা। কিন্তু ল্যাবরেটরির ভেতরে কোথাও পাওয়া গেল না মরগানকে।

'পালাতে পারবে না,' বারক বললো। 'মেসেজ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আশেপাশে সমস্ত রাস্তা ব্লক করে দিয়েছে পুলিশ এতোক্ষণে। ফাঁকি দিয়ে একটা মাছিও পালাতে পারবে না।'

পনেরো

খাবারের সুগন্ধ ভুরভুর করছে বাতাসে। মেহমানদের বসার জায়গা করা হয়েছে রেজাদের বাড়ির বাগানে। অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন পুলিশ চীফ ড্রেক ডানকান আর তাঁর সহকারী পল নিউম্যান। আকরাম এসেছে। নিড আর অ্যানিও এসেছে।

রান্নাঘর থেকে খাবার আনতে মিসেস মুরাদকে সাহায্য করছে অ্যানি।

খাবার পরিবেশন করছে রেজা আর সুজা।

পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে গল্প করছেন মিস্টার মুরাদ। এই বিশেষ দাওয়াতের ব্যবস্থাটা তিনিই করেছেন। ছেলেরা জটিল এক রহস্যের সুষ্ঠু সমাধান করতে পারায় তিনি আনন্দিত।

ডক্টর নেলী বিগল এলেন। ঠেলতে ঠেলতে আনছেন হুইল চেয়ারে বসা ডক্টর রিচারকে।

আকরামকে দেখেই ভুরু কোঁচকালেন রিচার। প্রায় গর্জে উঠলেন, 'এই, খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি চিড়িয়াখানায় যাও। বেশ কয়েকটা খাঁচা বানাতে হবে। হারামজাদারা ভেঙে...'

'আমি যাবো ?' বাধা দিয়ে বললো আকরাম। 'আমার তো চাকরিই নেই।'

'নেই কে বললো তোমাকে ? চাকরি যে গেছে, চিঠি পেয়েছো ?'

'না। কিন্তু আপনি বললেন…'

'তর্ক করো না, বেয়াদব ছেলে। খাওয়া শেষ হয়েছে ? জলদি যাও চিড়িয়াখানায়।'

আর কিছু বললো না আকরাম, কিংবা বলা ভালো, বলার সাহস হলো না। মিনমিন করে কি বললো সে-ই জানে।

মুচকি হাসলো রেজা আর সুজা।

মস্ত এক মাংসের টুকরো প্লেটে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আকরাম। ছুরি দিয়ে কেটে কাঁটাচামচে গাঁথছে ঠিকই, কিন্তু খেতে সাহস করছে না। করুণ চোখে তাকাচ্ছে খাবারগুলোর দিকে। রিচারকে নিয়ে মিস বিগল সরে যেতেই আকরামকে ওরা বললো, 'যাও, চাকরি এবার পাকা। তোমার কম্পিউটার কেনা আর ঠেকায় কে ?'

'সব তোমাদের জন্যে,' চোখ ছলছল করে উঠলো আকরামের। 'তোমরা সাহায্য না করলে…'

'আরে, গরু নাকি ছেলেটা ?' মুরুব্বিয়ানা ঢঙে বললো নিড। 'নলে কি ? বন্ধুর জন্যে বন্ধু জান দিয়ে দেয়, আর আমরা তো সামান্য সাপের কামড় খেতে গেছি…'

হেসে উঠলো অ্যানি। হাতে খাবারের ডিশ। মিসেস মুরাদও হাসলেন। নিডের কথা তার কানেও গেছে।

হাত নেড়ে ডাকলেন ডানকান, 'এই রেজা, শুনে যাও।'

রেজা কাছে গেলে বললেন, 'বসো। মরগান আর ককে তো ধরিয়ে দিলে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি এবার।'

'বলুন,' বসতে বসতে বললো রেজা।

ছুরি দিয়ে একটুকরো মাংস কেটে চামচে গাঁথতে গাঁথতে জিজ্ঞেস করলেন চীফ, 'সাপগুলো ল্যাবরেটরি থেকে বের করলো কিভাবে কক? বুঝেছো?'

'সহজেই,' রেজা বললো। 'ডক্টর রিচারের অফিসে ছিলো তখন জেমস কক। মরগান ছিলো ভেন্টের শ্যাফটে। ওখান থেকেই ট্র্যাংকুইলাইজার গান দিয়ে ডার্ট ছোঁড়ে সে।' রিচার আর ডাক্তার বিগলের দিকে তাকালো। 'হাসপাতালেও আরেকবার আপনাকে খুন করতে চেয়েছে ওরা, ডক্টর। ডার্টটা যখন মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে গেলাম, ভয় পেয়ে গেল কক। ও বুঝলো, ভেতরে কি আছে জেনে যাবেন ডাক্তার বিগল। বুঝে ফেলবেন, ডক্টর রিচারের শরীরে কি ঢোকানো হয়েছে।'

'রেজারা তখন ওখানে থাকাতেই বেঁচে গেছেন, ডক্টর,' খেতে খেতে বললো পল নিউম্যান।

'যাই হোক,' আসল কথায় ফিরে এলেন আবার ডানকান, ডক্টরকে বেহুঁশ করার পর ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিলো কক। মূল খাঁচা থেকে বের করে টাইগার স্নেকটাকে আরেকটা খাঁচায় ভরলো...'

'লোকগুলো মহাশয়তান,' মাঝখানে বলে উঠলেন রিচার।

'হ্যাঁ।' ডক্টরের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারলেন ডানকান।

'নিচে থেকে খাঁচাটা মরগানের হাতে দিলো কক। সেটা শ্যাফটে রেখে, দু'জনেই পাইপ বেয়ে নিচে নামলো। পাইপের ভেতর দিয়ে দিয়েই গিয়ে ঢুকলো যেখানে বিষ রাখা হয় সে-ঘরে। এ-বারও ভেন্টের মুখ দিয়ে নিচে নামলো কক। বিষ আর অ্যান্টি-ভেনিনের শিশি, জারগুলো এনে তুলে দিলো মরগানের হাতে। তারপর সমস্ত বাক্স দড়ি দিয়ে ছাতে টেনে তুললো ওদের সহ-কারীরা।'

চীফ থামলে খেই ধরলো পল নিউম্যান, 'ততোক্ষণে সিকিউ-রিটি গার্ডেরা ধাক্কাধাক্কি শুরু করছে ডক্টর রিচারের অফিসে, এখন স্পষ্ট হচ্ছে সব। দরজা খোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সুযোগে স্টোররুম থেকে বেরিয়ে ল্যাবের পেছন দিকে চলে গেল কক, যেখানে রাখা থাকে দামি সাপগুলো। ভেন্টের ভেতর দিয়ে এক এক করে আরও কয়েকটা খাঁচা তুলে দিলো ওপরে। তাড়াহুড়োয় খেয়াল রাখতে পারেনি, বুড়ো ডরির খাঁচাটাও তুলে দিলো। শ্যাফট দিয়ে ছাতে বেরিয়ে মরগান দেখলো, হাত থেকে কয়েকটা খাঁচা ফেলে দিয়েছে তার সহকারীরা।' হাসলো পুলিশ অফি-সার। 'নিশ্চয় দেখার মতো ঘটনা ঘটছিলো ছাতের ওপর তখন। বাক্স থেকে বেরিয়ে পড়েছে বিষাক্ত সাপ। যতো তাড়াতাড়ি পারলো, বাকি খাঁচাগুলো নিচে চালান করে দিলো ওরা। নিয়ে গিয়ে তুললো গাড়িতে। চিড়িয়াখানার গাড়ি। বাইরে বের করতে কোনো অসুবিধে হলো না। ওই দুই ব্যাটাও চিড়িয়াখানারই লোক তো। যা হোক, বাইরে নিয়ে এক ফাঁকে দুটো সাপ রেখে এলো আকরামদের বাড়ির বেসমেন্টে।'

'হ্যাঁ, তাই করেছে,' ডানকান বললেন। 'ও, আরেকটা ব্যাপার খোঁজ নিয়ে জেনেছি আমরা। ভেন্টের ফ্যানের ব্রেকার সুইচের বাক্সটা রয়েছে সাপগুলো যে ঘরে রাখা হয়, সে-ঘরে। ফলে পাওয়ার অফ করে দিয়ে ফ্যান বন্ধ করতে অসুবিধে হয়নি ককের। চুরি চলার সময় বন্ধ করে রেখেছিলো, তারপর বন্ধুরা বেরিয়ে যেতেই আবার চালু করে দেয়।'

'ডক্টর রিচার,' রেজা বললো, 'কয়েকটা কথা জানতে চাই আপনার কাছে।'

'কি কথা?'

'আপনাকে খুন করতে চাইলো কেন ওরা?'

'আমি বেঁচে থাকলে ওরা চুরি করে সারতে পারতো না, তাই। কিছুদিন থেকে এমনিতেই ককে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলাম আমি। মরগানের সঙ্গে ওর চলাফেরা, আচার-আচরণ ভালো লাগেনি আমার। আর ওই রিপোর্টারকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। ভীষণ পাজী লোক। ওরা জানতো, চুরি হলে, ওদেরকে সন্দেহ করছি একথা পুলিশকে বলে দেবো। এতোবড় দুশমন রেখে লাভ কি? সরিয়ে দেয়াটাই নিরাপদ।'

'হুঁ,' মাথা দোলালো রেজা। 'আমার বিশ্বাস আকরামের স্ক্রুড্রাইভার চুম্বকিত করে রেখেছিলো ককই। যাতে পাসের কোড গোলমাল হয়ে যায়। বেচারার ওপর আগে থেকেই লোকের কুনজর পড়াতে আরম্ভ করেছিলো। ঠিকই বলেছেন, লোকটা মহা শয়তান।'

'একেবারে পাজীর পা ঝাড়া। তবে সাপ সামলাতে পারতো

বটে···ওর মতো আরেকজন জোগাড় করা মুশকিল।'

'এক কাজ করুন না,' প্রস্তাবটা দিয়েই ফেললো রেজা, 'আকরামকে শিখিয়ে নিন। আর যাই করুক, আপনাকে খুন করে সাপ চুরি করার চেষ্টা করবে না সে।'

'হুঁ, মন্দ বলোনি,' ক্ষণিকের জন্যে একচিলতে হাসি ফুটলো গোমড়ামুখো বিজ্ঞানীর মুখে। আকরামের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন। ধমক লাগালেন বাজখাঁই কণ্ঠে, 'এই, তোমার খাওয়া হয়নি এখনও? জলদি যাও। আমি আসছি কয়েক মিনিটের মধ্যেই।'

কাঁচুমাচু হয়ে গেল বেচারা আকরামের মুখ।

হাসি চাপতে কষ্ট হলো উপস্থিত সকলের।

—ঃ শেষ ঃ—